রক্তভেজা গুজরাট

মানবতার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

রক্তেভেজা গুজরাট

মানবতার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ

[কতিপয় যুগান্তকারী নিবন্ধের অসাধারণ সংকলন]

উবায়দুর রহমান খান নদভী

প্রধান সম্পাদক ঃ ইসলামিক ইনস্টিটিউট জার্ণাল

সম্পাদক ঃ পন্থা।। আহবায়ক ঃ শুভশক্তি

কিতাব কেন্দ্র

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১-৮৪৫৩৩৭

॥ একটি ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র প্রকাশনা ॥

রক্তভেজা গুজরাট

মানবতার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ

উবায়দুর রহমান খান নদভী

❑

❑

প্রথম প্রকাশ ঃ

জানুয়ারী ২০০৩

❑

প্রকাশনায় ঃ

ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের পক্ষে –

ক্যাপ্টেন হায়দার

❑

হোল সেলার ঃ

কিতাব কেন্দ্র

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১-৮৪৫৩৩৭

❑

দাম ঃ সত্তর টাকা

অর্পণ

আসমুদ্র হিমাচল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে
কেবল সত্যধর্ম ইসলামের অনুসারী হওয়ার অপরাধে
যুগ যুগ ধরে
যারা ভোগ করে চলেছে
অনিঃশেষ নরক যন্ত্রণা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম

প্রারম্ভিকা ঃ রক্তেভেজা গুজরাট

বিষয়টি এতই সংবেদনপূর্ণ যে, এ নিয়ে নির্বিচারে কথা বলা বা কলম ধরা কোনটাই সমীচীন নয়। কেননা, দুঃখ অনুভূতি প্রকাশ থেকে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিছুতেই কাম্য নয়। সদ্ভাব ও সম্প্রীতির বাংলাদেশে মানুষের স্বাভাবিক অহিংস প্রবণতাকে বিকশিত ও লালন করাই এ দেশের জন্য কল্যাণকর।

পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মই এ কথা আদিতে বলে এসেছে যে, শান্তিই মুখ্য। সবার ওপর মানুষ সত্য তার ওপরে নাই। ইসলামের অনুসারী হয়ে বুকে যে তৃপ্তিটুকু পাই, সেটাও এর শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবতার জারক রসে সিক্ত প্রেমময় আবেদন থেকেই উৎসারিত।

বিগত সময়ে (২০০২ খৃস্টাব্দের প্রথমার্ধে) প্রতিবেশী ভারতের গুজরাট রাজ্যে যে অমানবিক মুসলিম নিধনযজ্ঞ সংঘটিত হলো, এ বিষয়ে পূর্ণ মিতভাব বজায় রেখে যারা উদ্বেগ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন তাদের কথা ও লেখার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। অনেক অমুসলিম বন্ধু, ভারতীয় অনেক চিন্তাবিদ, লেখক ও বুদ্ধিজীবী বিষয়টি নিয়ে যে ভারসাম্যপূর্ণ উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন, এসবের গুরুত্বও অপরিমেয়। বিশেষ করে এ কঠিন সময়টিতে ঢাকার সংবাদপত্রগুলোয় প্রকাশিত সচেতন লেখক, কলামিস্টগণের সুচিন্তিত অংশগ্রহণও উচ্চতর মূল্যায়নের হকদার।

সহজাত স্পর্শকাতর চেতনা, বোধ আর বিশ্বাসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ সব সময়-সংলাপ একসূত্রে গেঁথে রাখতে সচেষ্ট হলাম অনাগত দিনের কোন সন্ধানীর তরে। যারা অতীত দিনের সুখ-দুঃখ জেনে নিয়ে নির্মাণ করবে হিমালয়ান উপমহাদেশে শেষ নবীর উম্মতের দীঘল জীবনযাত্রার ইতিবৃত্ত। তাওহীদের আমানত বুকে নিয়ে যারা দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

যাদের পরামর্শ, লেখা, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির মাল-মসলা নিয়ে এ সংকলন নির্মিত তাদের কাছে প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে ঋণী। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। চিরমুক্তির তথা হেদায়েতের অমূল্য মর্যাদায় ভূষিত করুন অপর সম্প্রদায়ের সুধীদের। সংকলনের প্রবন্ধ, নিবন্ধ, প্রতিবেদন ইত্যাদির বক্তব্য সংশ্লিষ্ট লেখকদের একান্তই নিজস্ব। সম্পাদকের দায় কেবল সূত্রধারের। ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র সংকলনের স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক। মুসলিম-বান্ধব এ সংস্থাটির কার্যক্রম প্রসারেই এর প্রকাশনার বৈষয়িক অর্জন ব্যয়িত হয়। মুসলিম মিল্লাতের শুভকামনায় নিবেদিত এ সংস্থার কার্যক্রম আরো বেগবান ও লক্ষ্যভেদী হোক, এই দোয়া করে বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্‌র রাহুমুক্তির প্রত্যাশায়।

বিনীত

উবায়দুর রহমান খান নদভী

ঢাকা ॥ ৭ নভেম্বর ২০০২
১ রমযান ১৪২৩ হিজরী

ভারতের গুজরাটে ধর্ষণ গণহত্যা ঃ কোথায় গেল অহিংসা পরম ধর্ম

'অহিংস পরম ধর্ম' আর 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারত'-এই দুই মুখোশের অন্তরালে ভারতের চরমপন্থী হিন্দু মৌলবাদী গোঁড়া সাধু-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সেখানকার মুসলমানদের ওপর যে বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে এবং এখনও চালাচ্ছে তা ক্রমান্বয়ে অন্ধকার ভেদ করে বাইরের আলোতে প্রকাশ হওয়া শুরু করেছে। গত ২২ এপ্রিল ২০০২ তারিখের ইংরেজী নিউজউইর্ক পত্রিকার ২৪ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে যে সচিত্র নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে যে কোন ধর্মের বিবেকবান মানুষের মন ব্যথিত না হয়ে পারে না। আমাদের দেশে এমন কিছু হিন্দু নেতা ও কলামিস্ট আছেন, যারা এখানের দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে তিলকে তাল করে সারাবিশ্বের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। অথচ গুজরাটের এতবড় একটা মুসলমান নিধনের ঘটনা সম্পর্কে তথাকথিত হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ ঐক্যপরিষদ টু শব্দটি পর্যন্ত করছে না। মনে হয়, এদেশের দাদা-বাবুরা গুজরাটের এই ঘটনায় মহাখুশী। খুশি হওয়ারই কথা- অচ্ছুৎ ম্লেচ্ছরা মারা যাচ্ছে, তাতে তাদের কি? আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তারা প্রকারান্তরে এ দেশটিকে মনে প্রাণে ভালবাসতে পারছে না। সুতরাং তাদের কাছ থেকে এ ধরনের আচরণ আশা করাটাই স্বাভাবিক। নিউজউইক পত্রিকার উল্লিখিত সচিত্র নিবন্ধের ছবিতে একটি দাঙ্গা বিধ্বস্ত পোড়া মসজিদের সামনে মোহাম্মদ লাল মিয়া নামের এক রিকশাওয়ালা পোড়া মসজিদের দিকে এক করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। A Ghilling Message' শিরোনামের এই নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে, রিকশাওয়ালা লাল মিয়া হতভম্ব হয়ে এক দৃষ্টিতে গুজরাটের নরোদা পাতিয়া শহরের পোড়া মসজিদটির দিকে তাকিয়ে আছে। ফেব্রুয়ারী ২৮ তারিখে হিন্দু উগ্রবাদীদের আক্রমণের পর এই প্রথম সে তার নিজের মহল্লায় এসে এ দৃশ্য দেখতে পায়। পুলিশ ও স্থানীয় সরকারের নীরব সমর্থনে এই মুসলমান হত্যাযজ্ঞটি সংঘটিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মান্ধ গোষ্ঠী মুসলমানদের ঘরবাড়ি, মসজিদ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ লাল মিয়ার কয়েক ডজন বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীকে পুড়িয়ে মেরেছে। লাল মিয়া তার স্ত্রী ও দু'সন্তান নিয়ে কোনরকমে পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচিয়েছে। তার কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাদের মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত। দাঙ্গাকবলিত বিপুলসংখ্যক মুসলমান নিধন এলাকাকে হিন্দু এলাকা থেকে পৃথিকীকরণকৃত দেয়ালে হিন্দি ভাষায় লিখে

দেয়া হয়েছে, এটা প্রভু রামের রাজ্য। কোন মুসলমান এখানে থাকতে পারে না। ভারত হিন্দুদের জন্য। (This is the kingdom of Lord Ram. No Muslim can stay here. lndia is for the Hindus) লালমিয়া যখন সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ দেখছিল তখন একজন অস্ত্রধারী পুলিশ তার জীবনের নিরাপত্তার খাতিরে ঐ স্থান ত্যাগ করার পরামর্শ দেয়। অতঃপর সে দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। ফিরে যাওয়ার পথে প্রায় ১০০ মিটার যাওয়ার পর লাল মিয়া তার একজন প্রতিবেশীকে দেখে যেন ভূত দেখেছে, এই ভয়ে ফিরে অদৃশ্য হয়ে যায়। পত্রিকাটি আরও লিখেছে, আহমেদাবাদের ১৫ কিলোমিটার উত্তরে জওয়ান নগর একটি গ্রাম। এটি লম্বালম্বি দুভাগে বিভক্ত। এখানে হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে বাস করত। এর হিন্দু বসতিপূর্ণ এলাকাটিতে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে, অন্যদিকে মুসলমান অধ্যুষিত অংশটি দেখলে মনে হয় যেন এখানে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। রাস্তাগুলো জনশূন্য। সেখানে ইট-পাথরের টুকরা ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে। আর কিছু হিন্দু লুটেরা নৃশংস কাজে লিপ্ত রয়েছে। এভাবে পত্রিকাটির প্রায় চার পৃষ্ঠা জুড়ে এই হত্যাযজ্ঞ ও তাণ্ডবলীলার সচিত্র সংবাদ রয়েছে। গত ৩ মে, ২০০২ তারিখে ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় গুজরাট ট্যাজেডি ঃ নারীর সম্ভ্রমহানির কিছু হৃদয়বিদারক ঘটনা শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংবাদে আহমেদাবাদ ভিত্তিক সিটিজেনস ইনিশিয়েটিভ' এর একটি তথ্য অনুসন্ধানী দলের বরাত দিয়ে যে মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা দস্তুর মত লোমহর্ষক। আহমেদাবাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের লাজলজ্জা, সভ্যতা ও মানবতাবোধ বলে কিছু আছে বলে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। এসব বর্ণ হিন্দুদের পবিত্র ধর্ম কি তাদের এই শিক্ষা দিয়েছে যে, পাইকারীভাবে গণহত্যা ও নারী ধর্ষণ কর? এ শিক্ষা নিশ্চয়ই তাদের ধর্ম দেয়নি। তা হলে নামাবলী গায়ে দিয়ে রাম নাম জপ্ আর অহিংস পরম ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাইনবোর্ড লাগিয়ে এই ভণ্ডামির উদ্দেশ্য কি? উল্লেখিত সংবাদের শুরুতেই বলা হয়েছে,... একদল দাঙ্গাকারী তাড়া করছে, ছুঁড়ছে জ্বলন্ত টায়ার। তারা আমাদেরকে বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। আমরা ছুটছি পাগলের মত। আমি স্বচক্ষে দেখলাম, ৮ থেকে ১০টি নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষিত হতে।

ষোড়শী মেহেরুন্নেসাকে ওরা নগ্ন করল আমার সামনেই এবং ওরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হায়েনার মতই। মেয়েদের ওরা ধর্ষণ করল প্রকাশ্যে রাস্তায়। দেখলাম ধর্ষণ শেষে একটি মেয়ের যৌনাঙ্গ ওরা ফালি ফালি করে কাটল এবং তারপর তার শরীরে ধরিয়ে দিল আগুন। কিন্তু আজ সে ঘটনার চিহ্নমাত্র নেই।'

উল্লিখিত রিপোর্টের অন্যত্র ১৩ বছরের আজহার উদ্দীনের জবানবন্দিতে বলা হয়েছে, 'আমি গুড্ডু ছারাকে দেখেছি ফারজানাকে ধর্ষণ করতে। হুসেইন নগরের

বাসিন্দা ফারজানা। তারা এক পর্যায়ে ফারজানার পাকস্থলীতে রড ঢুকিয়ে দেয়। পরে তাকে পোড়ানো হয়। ১২ বছরের নূরজাহানকেও ধর্ষণ করা হয়। ধর্ষক ছিল গুড্ডু, সুরেশ, নরেশ ছাড়াও হরিয়া। আমি রাজ্য পরিবহন বিভাগের কর্মী ভবানী সিংকে দেখেছি একটি বালক ও অপর পাঁচজনকে হত্যা করতে।' আব্দুল উসমান বলেছেন, ছড়া নগর ও কুবের নগর থেকে এল একদল উন্মত্ত দুর্বৃত্ত। তারা আমার ২২ বছরের মেয়েসহ এলাকার মা-মেয়েদের নগ্ন করল এবং শুরু করল গণধর্ষণ। আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। আমার স্ত্রীসহ আমার পরিবারের ৭ সদস্যকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এদের মধ্যে আমার ৭, ১৪ ও ১৮ বছরের ছেলে এবং ২, ৪ ও ২২ বছরের মেয়ে রয়েছে। আমার বড় কন্যা সে পরে হাসপাতালে মারা গেছে, যে আমাকে বলে গেছে, আব্বু আমাদের যারা ধর্ষণ করেছে তাদের পরনে শার্ট ছিল। ওই পশুগুলো ধর্ষণ শেষে প্রথমে তার মাথায় আঘাত হানে এবং পরে শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার শরীরের ৮০ ভাগ পুড়ে গিয়েছিল। ৩০ মার্চ, ২০০২ পঞ্চমহল জেলার কালোল ক্যাম্পের সুলতানী জানায়, ২৮ ফেব্রুয়ারীর দুপুরে আমরা একটি টেম্পোতে পালাচ্ছিলাম। প্রায় ৪০ জন ছিলাম। উন্মত্তরা তাড়া করছে। আমার স্বামী ফিরোজ ছিলেন টেম্পোর চালকের আসনে। কালোলের কাছেই একটি মারুতী গাড়ি আমাদের পথরোধ করে। আমার কোলে ছিল আমার ছেলে ফৈজান। চারদিক থেকে সশস্ত্র লোকজন ছুটে আসে আমাদের দিকে। শত শত মানুষের সামনেই আমাকে উলঙ্গ করা হল। আমার কোল থেকে কখন ছিটকে পড়ে যায় ফৈজান। পালাক্রমে আমাকে ধর্ষণ করা হয়। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল আমি কেবল আমার শিশু পুত্রের ক্রন্দন শুনেছি। তিনজনের পর আমি আর শুনতে পাইনি কিছু। এরপর তারা ধারাল অস্ত্র দিয়ে আমার পায়ের গোড়ালি কেটে দেয়। ৩০ মার্চ পর্যন্ত এ ঘটনার কোন এফআইআর দাখিল করা হয়নি।

অন্য একটি ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমরা যে যেদিকে পারলাম ছুটলাম। কিন্তু দাঙ্গাকারীরা আমাদের কয়েকজনকে ধরে ফেলে। আমি দাঙ্গাকারীদের দুজনকে আমার গ্রামেরই গণবরিয়া এবং সুনীলকে চিনলাম। এ দু'জনই আমার মেয়ে শাবানা, রোকেয়া, সুহানাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায়। ওরা পালাক্রমে ধর্ষিত হল। আর তার পর কানে এল ওদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল। কোন চিহ্ন রাখা যাবে না। আমি দেখলাম জ্বলে উঠেছে আগুনের লেলিহান শিখা। এ রকম অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে এ রিপোর্টে। রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হয়েছে, যারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে তাদের অধিকাংশকেই জীবন্ত পুড়ে মারা হয়েছে। নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের মধ্যে আঁতাতের প্রমাণ পাওয়া গেছে। পশুরও একটা লজ্জা আছে। কুকুরেরও লাজ-লজ্জা বোধ আছে।

কিন্তু গুজরাটের নরপশুদের সে বোধও নেই। মা-বাবার সামনে প্রকাশ্যে যারা নারী ধর্ষণ করতে পারে, তাদের পশুর চেয়েও অধম নরপশু বললে অত্যুক্তি হবে না। এরপরও কীভাবে গুজরাটের রাজ্য সরকার এবং বাজপেয়ী সরকার বিশ্বের কাছে নিজেদের সভ্য জাতি বলে পরিচয় দিবেন? কীভাবে তারা বিশ্ববাসীর সামনে মুখ দেখাবেন? তাদের উচিত ছিল, ঐ জঘন্য অপকর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া এবং এই অপরাধ দমনের ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়ে পদত্যাগ করা। কিন্তু তারা ত তা করেইনি, বরং উল্টো মুসলমানদের ওপর দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের মুখ রক্ষা করতে চাচ্ছেন। কিন্তু তাদের জানা উচিত, পাপ কোনদিন চাপা থাকে না। আর ঐ আধুনিক প্রযুক্তির যুগে কোন কিছুই চাপা রাখা সম্ভব নয়। সত্য একদিন সূর্যের আলোর মত ফুটে উঠবেই।

আমাদের দেশের কোন কোন দাদা-বাবু তাদের নিবন্ধে লিখে থাকেন যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হওয়ার কারণেই নাকি এসব তথাকথিত হানাহানি বাংলাদেশে হচ্ছে। কী চমৎকার কথা! দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হওয়ার ফলেই আজকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমান নারীরা ইজ্জত নিয়ে এখনও বেঁচে আছে। তা না হলে গুজরাটের মত হিন্দু লম্পট, বদমায়েশ, নরপশুদের হিংস্র থাবা থেকে কোন মুসলমান নারীরই ইজ্জত রক্ষা পেত না, যেভাবে ১৯৪৬ সালের রায়টে রক্ষা পায়নি। নিউজউইক' পত্রিকার খবর অনুযায়ী ভারতীয় হিন্দুরা বলে ভারত হিন্দুদের। আমরা বলি ভারত মুসলমানদেরই ছিল। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মহীশুর, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর-এসব মুসলমান রাষ্ট্র ছিল। রায় দুর্লভ, জগৎশ্রেষ্ঠ, রাজবল্লভ, উমি চাঁদ-এর মত বেঈমানরাই মোটা বুদ্ধির মীরজাফরকে ছলে-বলে-কৌশলে হাত করে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পরাজিত করে এ দেশে ইংরেজ শাসন কায়েম করে ২০০ বছর ইংরেজদের গোলামি করতে বাধ্য করে। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক লর্ড মাউন্টব্যাটেন ৩ জুন, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত তাঁর পরিকল্পনার যে ঘোষণা দেন তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হবে।

(২) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভারত না পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে তা গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

(৩) ঐ একইরূপে গণভোটের মাধ্যমে সিলেটের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা হবে।

(৪) পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশ বিভক্ত হবে কিনা তা ঐ দু'দেশের প্রাদেশিক পরিষদ নির্ধারণ করবে।

(৫) ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলো ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন রাষ্ট্রে যোগ দিবে তা তারাই নির্ধারণ করবে।

মুসলিম লীগ গণভোটে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিলেট, বঙ্গদেশ এবং পাঞ্জাবে বিভক্ত হওয়ার পক্ষে রায় লাভ করে। তথ্য সূত্র ঃ A short history of mualim rul by Manzoor Ahmad Hanifi, page-280.

সুতরাং ভারত শুধু হিন্দুদের, এ দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে আসামের করিমগঞ্জ মহকুমা, কাছাড় জেলা, মালদাহ, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ছোট বেলায় মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি, নানারকম উপঢৌকন প্রদানের মাধ্যমে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে ম্যানেজ করে তৎকালীন কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা এই অপকর্ম করেছেন আর এ কারণেই ভারতের মুসলমানরা আজ হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে।

আজকে ভারতে যে জঘন্য নারকীয় কাণ্ড ঘটছে তা সকল মানব সভ্যতাকে হার মানিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত বসনিয়ার জঘন্য মানবতাবিরোধী অপকর্মকেও হার মানিয়েছে। মানুষ যে কত ইতর, জানোয়ার হতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভারতের আহমেদাবাদের এই গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড। এর নিন্দা করার ভাষা আমাদের জানা নেই। মধ্যপ্রাচ্য, সউদী আরব ইত্যাদি মুসলমান রাষ্ট্রের সাহায্য-সহযোগিতা, বাণিজ্যিক সুবিধাপ্রাপ্তির সুবাদে ভারত আজকের আর্থিক সচ্ছলতার মুখ দেখেছে, সেই মুসলমানদের সাথে ভারতের উগ্রবাদী নরপশুরা যে আচরণ করেছে তার শিক্ষা অবশ্যই ভারতের পাওয়া উচিত। আমরা বিশ্বের সকল মুসলমান রাষ্ট্রের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করব এবং আশা করব তারা ভারতীয় মুসলমানদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের এই বর্বরোচিত আচরণের সমুচিত জবাব দিবেন।

সভ্য পৃথিবীর কলঙ্ক নরপিশাচদের তাণ্ডব

সম্প্রতি ভারতের গুজরাটে ও ফিলিস্তিনে ইতিহাসের যে ভয়াবহ নিধনযজ্ঞ, নারকীয় তাণ্ডবলীলা, পাইকারী ধর্ষণ ও লুণ্ঠন সংঘটিত হয়েছে তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। গুজরাটের মুসলিম হত্যাকাণ্ডের সাথে ফিলিস্তিনের নিধনযজ্ঞের সাজুয্য রয়েছে। গুজরাট ও ফিলিস্তিন ট্র্যাজেডি মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি সিগন্যাল। এখনই যদি মুসলিম উম্মাহ এই বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কার্যকর বদলা নিতে না পারে তাহলে সহিংসতা ও ধ্বংসলীলা ভারত ও ফিলিস্তিনের নতুন নতুন জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। ভারতের সাথে ইসরাইলের রাজনৈতিক সখ্যতা ও সামরিক চুক্তি রয়েছে। দিল্লী, বোম্বে ও কলিকাতায় রয়েছে ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ-এর অফিস। গুজরাট ও ফিলিস্তিনের নৃশংসতা ও হত্যাকাণ্ড আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। সুদূরপ্রসারী নীলনকশার অংশ হিসেবে জাতিসত্তা

বিনাশী এই ঘৃণ্য তৎপরতা পরিচালিত হচ্ছে। এখনই যদি মুসলমানরা সচেতন না হয় এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ভুল করে তাহলে স্পেনের ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে ভারতে ও ফিলিস্তিনে।

গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা ও গণধর্ষণ

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ তারিখে গোধরা রেলস্টেশনে একটা পরিকল্পিত অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটিয়ে ৫৮ জন হিন্দু করসেবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পুরো গুজরাট রাজ্যে যে নারকীয় তাণ্ডব, হত্যাযজ্ঞ, গণধর্ষণ, লুণ্ঠন শুরু হয়েছে তা আজো থামেনি। অতীতেও ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে কিন্তু এতটা সুসংগঠিত ও পরিকল্পিত আক্রমণ ও আগ্রাসন আর হয়নি। এটা দু'তরফা দাঙ্গা নয়; বরং একতরফা মুসলিম হত্যাযজ্ঞ। এখানে ধর্ষক ও ঘাতক হিন্দু আর বর্বরতার নির্মম শিকার মুসলমান। প্রকৃতপক্ষে মুসলমাননিধন ও মুসলিম মহিলাদের পাইকারী ধর্ষণকে কেন্দ্র করে গুজরাটের সহিংসতা হিন্দুদের জন্য একটি উৎসবে পরিণত হয়। দাঙ্গার সময় ত্রিশূলধারীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। হামলাকারী হিন্দুদের হাতের তলোয়ারে 'বজরং দল' শব্দ দুটি উৎকীর্ণ ছিল। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যক্ষ হুকুমে পরিচালিত এই সহিংসতায় তিন হাজার মুসলমান শহীদ হয়েছেন। এক লাখ মুসলমান হয়েছেন উদ্বাস্তু সহায় সম্পত্তি ও বাস্তুভিটা হারিয়ে। আসলে গোধরা হত্যাকাণ্ডে কারা দায়ী তা আজ পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি বা শনাক্ত করার চেষ্টা করাও হয়নি। কেবল আন্দাজ-অনুমান করে সাম্প্রদায়িকতার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম উৎখাতকামী মৌলবাদী বজরং দল আরএসএস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সশস্ত্র ক্যাডাররা। ভারতের স্বনামধন্য লেখিকা অরুন্ধতী রায় Outlook পত্রিকায় প্রকাশিত Democracy; Who's she when she's at home' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন, We still don't know who exactly was responsible for the carnage in Godhra' অর্থাৎ আমরা এখনো জানি না ঠিক কারা গোধরার ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। তথ্য সূত্র ঃ ১৭ মে ২০০২ তারিখের সাপ্তাহিক হলিডে। অরুন্ধতী রায়ের লেখাতেই আছে রাতের অন্ধকারে আধুনিক উর্দু কবিতার জনক ওয়ালী গুজরাটী ও উপমহাদেশের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ ফইয়াজ আলী খানের কবর ভেঙ্গে সড়ক তৈরি করা হয়েছে। বাড়ি, দোকানপাট, কাপড়ের কল, বাস, প্রাইভেট মোটরগাড়ি সব কিছুতেই আগুন দেয়া হয়েছে, লুটপাট করা হয়েছে। শতসহস্র মানুষ চাকরি হারিয়েছে। দাঙ্গাবাজরা সাবেক কংগ্রেস এমপি ইকবাল এহসান জাফরীর বাড়ি ঘেরাও করে। পুলিশের ডিজি, পুলিশ কমিশনার, চীফ সেক্রেটারী,

এডিশনাল সেক্রেটারী (হোম) প্রত্যেককেই তিনি ফোন করেন, কিন্তু প্রত্যেকেই তার ফোন কল অগ্রাহ্য করে। তার বাড়ির চারদিকে থাকা মোবাইল পুলিশ ভ্যান নড়াচড়া না করে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঙ্গাবাজরা এহসান জাফরীর বাড়িতে প্রবেশ করে তার মেয়েদের উলঙ্গ করে তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারে এবং তার মাথা কেটে ফেলে, তার শরীরকে টুকরো টুকরো করে।২

গবেষক বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন ঃ 'গুজরাটের ক্রিমিনাল মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো ভারতের বিজেপি ও সংঘ পরিবারের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী নিজেও গুজরাটের সাম্প্রদায়িক নিধনযজ্ঞের সঙ্গে ভালভাবেই সম্পর্কিত।৩'

১৯ মে ২০০২ তারিখের দ্য ডেইলী স্টারে প্রকাশিত খবর, Human Right Watch-এর বিস্তারিত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আতঙ্কিত হয়ে মানুষ যেখানেই ফোন করেছে হয় তারা কোন সাড়া শব্দ করেনি নয়তো বলেছে তোমাদের রক্ষার জন্য ওপর থেকে আমাদের কাছে কোন নির্দেশ নেই। যদি ভারতে থাকতে চাও তাহলে নিজেদের রক্ষা করতে শেখো; কি ব্যাপার! তোমরা জীবিত আছ? তোমাদেরও মরা উচিত ছিল; কার বাড়িতে আগুন লেগেছে মুসলমানের না হিন্দুর?৪

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিবর্গ গুজরাট সফরের পর প্রণীত রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, এই সহিংসতার পেছনে সরকারের প্রত্যক্ষ মদদ রয়েছে। মুসলমানদের উৎখাত করার জন্য এই হামলা পরিচলিত হয়।

ভারতের আইএএস অফিসার হর্ষ মান্দার, যিনি পূর্বে ইন্দোরে সহকারী কালেক্টরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, গুজরাটের ২৯টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণকারী ৫৩ হাজার মৃত্যু তাড়িত নর-নারীদের পরিদর্শন করে এক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

What can yon say about a woman, eight months pregnant, who begged to be spared. Her assilants instead slit opened her stomach. pulled out her foetus and slaughtered it before her eyes. What can you say about a family of nineteen being killed by flooding their house with water and then electrocuting them with high tension electricity. What Gujrart witnessed was not a riot, but a terrorist attack followed by a systematic planned massacre, a pogram.

অর্থাৎ 'দাঙ্গাবাজরা আট মাসের গর্ভবতী মায়ের পেট চিরে ভ্রূণ বের করে এনে শত আর্তনাদ সত্ত্বেও তার চোখের সামনে এটাকে টুকরো টুকরো করে

কেটে ফেলে। ১৯ জন সদস্যের এক পরিবারকে তাদেরই ঘরের উঠোনে অবরুদ্ধ করে, হোস পাইপের তীব্র স্রোত ধারায় হাঁটু অব্দি ডোবানো হয়, তারপর হাইটেনশন বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে সেই অবরুদ্ধ জলরাশির মধ্যে দণ্ডায়মান, অজানা আতঙ্কের ভয়ঙ্কর আঘাতে প্রস্তরবৎ নারী-শিশুসহ ১৯ জনকে হত্যা করা হলো। গুজরাট যা প্রত্যক্ষ করেছে তা কেবল দাঙ্গা ছিল না, ছিল সন্ত্রাসী আক্রমণ, পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ ও নারকীয় হত্যাকাণ্ড ৫।' তথ্য সূত্র ঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ২০০২ তারিখের 'সানন্দা'।

হর্ষ মান্দার বলেন, 'ক্লীবত্ব আর অপরিমেয় বিকৃতির সশস্ত্র জানোয়ারেরা নিজেরাই উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই জীবন্মৃত মেয়েদের সামনে। তারপর মাতৃসমাকে ধর্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে পুত্রের বয়সী ত্রিশূলধারীকে, বাপের বয়সী সংঘী কুকুরের মতো রমণ করেছে কন্যাসম কিশোরীকে। মধ্য বয়সিনীকে কিশোর, ফুটফুটে বালিকাকে প্রৌঢ় এভাবে পর্যায়ক্রমে চলেছে অবর্ণনীয় যৌন-সন্ত্রাস। গুজরাটের আকাশে এখনও ভয়াবহ আবিল প্রশ্বাসের পাশব শব্দ আপনাকে সেই অন্তঃহীন বর্বরতার সন্ধান দেবে ৬।' তথ্য সূত্র ঃ ১৬ থেকে ৩১ মে ২০০২ তারিখের ঢাকার পালাবদল-এর ২৩ থেকে ২৪ পৃষ্ঠা।

গত জুন ২০০২ তারিখ মঙ্গলবার দৈনিক ইনকিলাবের আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠায় প্রকাশিত খবর, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ওজরাটে ৩ হাজারেরও বেশি মুসলমান গণহত্যার শিকার হয়েছেন। মুসলিমবিদ্বেষী আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো গুজরাটে চলমান এই গণহত্যাযজ্ঞকে গত কয়েক দশকের মধ্যে অনুষ্ঠিত সবচেয়ে জঘন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে অভিহিত করলেও আসলে তা হচ্ছে অনেক আগে থেকে পরিকল্পিত মুসলিম নিধনযজ্ঞ। এর পেছনে রয়েছে সুদূরপ্রসারী ও স্বপ্নমেয়াদি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য হাসিলের অভিপ্রায়। এ বিষয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্টগুলোতে হিন্দু মনের এই অমানবিকতার, নৃশংসতার এবং তাদের উলঙ্গ পশু প্রবৃত্তির নগ্নরূপটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। একটা অজুহাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোধরায় একটি এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিসংযোগে নিম্নবর্ণের হিন্দু করসেবক (এবং কিছু মুসলমানকেও) পুড়িয়ে মারা ঘটনাটি ছিল সংখ্যালঘু বৈদিক ব্রাহ্মণদের তরফে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে উন্মত্ত করে তোলার একটা পূর্ব পরিকল্পনারই অংশ। মনে রাখতে হবে, মনুসংহিতার সমাজের বিধান মোতাবেক যে কোনো বয়সের হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করলে বা নিম্নবর্ণের হিন্দু নারী-পুরুষদের হত্যা করলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কোনো পাপ হয় না। আর উপমহাদেশে মনুসংহিতার সমাজের এক জাতিতত্ত্বের ধারণায় উপমহাদেশে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার তো কোনো অধিকারই নেই।

গুজরাটে মুসলিম নিধনযজ্ঞ এখনও অব্যাহত আছে। গণহত্যার শিকার হয়ে যেসব মানুষ বিভিন্ন অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন, মুসলিম নিধনযজ্ঞের মদদদাতা ও পৃষ্ঠপোষক বিজেপি সরকার এখন সেগুলো বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু স্বজনহারা মুসলমানরা এখনও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) এবং এই সংঘ পরিবারের বজরং দল ও বিশ্বহিন্দু পরিষদের মুসলিমবিদ্বেষী এবং মুসলিম উৎখাতকামী দীক্ষিত লোকজনদের নৃশংসতার কথা ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কথা স্মরণ করে নিজ নিজ বাড়ি ঘরে ফিরে যাওয়ার সাহস পাচ্ছেন না। গুজরাটের বাণিজ্যিক রাজধানী আহমেদাবাদের বিভিন্ন শিবিরে এখনও ২৭ হাজার বনি আদম ধুঁকে ধুঁকে কালাতিপাত করছেন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে বেসরকারি ও অস্থায়ী এসব ত্রাণ শিবিরের অসহায় ও মজলুম মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার খবরে অমানবিকতার দীক্ষাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস)-এর রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি শাসিত গুজরাট রাজ্য সরকার বিব্রত।

সংবাদ সংস্থা এএফপি'র খবরে প্রকাশ, সরকার ত্রাণ শিবিরগুলো বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) এবং সংঘ পরিবারভুক্ত বজরং দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, দুর্গা বাহিনী, শিব সেনা প্রভৃতি মুসলিম উৎখাতকামী অমানবিক চিন্তা-চেতনায় দীক্ষিত সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন এবং আরএসএস-এর রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র কাজ-কর্মগুলো যারা লক্ষ করছেন তাদের স্পষ্ট বক্তব্য, হিন্দুদের মধ্যে বর্তমানে যে মুসলিমবিদ্বেষী ও মুসলিম উৎখাতকামী আবেগ ক্রিয়াশীল, তাকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি গুজরাট রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে আবার যাতে জয়লাভ করতে পারে সেজন্য গুজরাটকে আগাম নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করতে সরকার তড়িঘড়ি করে এসব উদ্বাস্তু শিবির বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে।

গুজরাটে মুসলমানদের রক্তের দাগ এখনও শুকায়নি; মুসলমানদের রক্ত ঝরাও এখনও থামেনি; থামেনি স্বজনহারা মানুষগুলোর কান্না। এরই মধ্যে গুজরাটে বিধান সভা নির্বাচনের ব্যাপারে মুসলিম উৎখাতকামী সরকারের আগাম চিন্তা-ভাবনা থেকে তার স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির প্রমাণ মেলে।

গুজরাটের বাস্তুহারা মুসলমানরা বলেন, সরকার তাদেরকে নিরাপত্তার যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তারা তা বিশ্বাস করেন না। পুলিশ নিজেই যেখানে এই গণহত্যায় সক্রিয় অংশ নিয়েছে কিংবা হত্যাকাণ্ড রোধে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেছে, সেখানে মুসলমানরা কীভাবে সরকারের দেওয়া নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারে?

মোহাম্মদ ভাই নামের একজন ফল বিক্রেতা বলেন, পুলিশের উপস্থিতিতে আমরা যখন নিরাপত্তা পাইনি তখন আর কীভাবে আমাদের নিরাপত্তা দেওয়া

হবে? গত ১১ জুন ত্রাণ শিবির ভেঙ্গে দেওয়ার পর মোহাম্মদ ভাই এখন রাস্তায় খোলা আকাশের নিচে বসবাস করেছেন।

১৯ বছরের কিশোরী গুলশান নাহার খান পাঠান সম্প্রতি আহমেদাবাদের উপকণ্ঠে রামোলে তার নিজ বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু ১০ মার্চের নৃশংসতার ভয়াবহ ও দুঃসহ স্মৃতি তাকে তাড়া করার কারণে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। যে বাড়িতে তার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে সেই প্রাণপ্রিয় বাড়ি আজ তার কাছে এক মূর্তিমান বিভীষিকা। এ বাড়িতে সে তার মাকে হারিয়েছে। মা হারানোর দুর্বিষহ স্মৃতির বোঝা বহন করতে না পেরে গুলশান নাহার খান গৃহে কোনো রকমে ছয়দিন অতিবাহিত করার পর আবার শাহ্ আলম উদ্বাস্তু শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। উদ্বাস্তু শিবিরে ফিরে এসে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। বাকরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন, 'তারা আমার মাকে মেরে ফেলেছে। আমি আমার ভাইকে খুঁজে পাচ্ছি না। পুলিশ ও বজরং দলের সদস্যরা আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছিল।

প্রায় ৪শ' গ্রামবাসী আহমেদাবাদের ক্যাম্প থেকে বারবার তাদের বাড়িঘরে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রতিবারই তারা হিন্দুদের হামলার শিকার হয়েছেন। হিন্দুরা তাদেরকে তাদের মুসলিম জীবনধারা ত্যাগ করতে বলেছে।

পানভাদ গ্রামের সাবেক মাতব্বর বাল্লি ভাই প্যাটেল জানান, 'তারা আমাদেরকে হিন্দু জীবনধারা গ্রহণ করতে বলেছে এবং বাড়িঘরে ফিরে আসার ক্ষেত্রে নানা ধরনের কঠোর শর্ত আরোপ করছে। এসব শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে আর বাড়িঘরে ফিরতে না দেয়া।'

অন্তত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের উচিত, অন্তত নেহরু-লিয়াকত চুক্তি মোতাবেক ভারতের মুসলমানদের আর্থ-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়ে ভারতের শাসক সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মনুসংহিতার সমাজ, তাদের এক জাতিতত্ত্ব, তাদের শুদ্ধি আন্দোলন, শুদ্ধি অভিযান, উপমহাদেশের মুসলমানদের আর্থ-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চিন্তা-ভাবনা তারা গ্রহণ করেছেন কিনা এসব বিষয়ে জানতে চাওয়া উচিত।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) এবং বজরং দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, দুর্গা বাহিনী, শিবসেনা ইত্যাকার যেসব আধা-সামরিক সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসী সংগঠন প্রকাশ্যে তাদের বই-পুস্তকে এবং পত্র-পত্রিকায় মুসলিম উৎখাতের কথা বলে, মুসলমানদের হিন্দু হতে বাধ্য করতে চায় তাদেরকে নিষিদ্ধ করা হয় না কেন, সে বিষয়েও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে জানতে চাওয়া দরকার। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের এটা নৈতিক দায়িত্ব।

গত ২৫ জুন দৈনিক ইনকিলাবের আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠায় ইন্টারনেট থেকে পরিবেশিত খবর, গুজরাটে গণহত্যা শুরু হওয়ার পর তিন মাস পেরিয়ে গেছে। হাজার হাজার মুসলমান এখনো ত্রাণ শিবিরগুলোতে একরকম বন্দি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ পরিবারের সংগঠন বজরং দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদের সদস্যদের হুমকির মুখে তারা না পারছেন নিজ বাড়ি ঘরে ফিরতে আর না পারছে খাদ্য ও ওষুধবিহীন শিবিরগুলোতে থাকতে। সংঘ পরিবারের বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা এইসব মুসলমানদের বাড়িঘর ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। চালিয়েছে লুটপাট, করেছে অগ্নিসংযোগ। মুসলিম উৎখাতকামী হিন্দুদের হামলা থেকে সামান্য রিকশাচালকের বাড়িও রেহাই পায়নি। এমনি এক রিকশাচলক সেলিম ইসমাইল ত্রাণ শিবির থেকে বেরিয়ে এক ফাঁকে সে দেখতে চেয়েছিল তার কুঁড়েঘরের অবস্থা। সেখানে গিয়ে বুঝতেই পারেনি তার ঘরটি কোথায় ছিল। আরএসএস-এর রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির নেতৃত্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং গুজরাট রাজ্য সরকার এখন মুসলমানদের ওপর চাপ দিচ্ছে বাড়ি ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য। অথচ মুসলিম উৎখাতকামী হিন্দুরা পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় মুসলমানদের বাড়িঘরের কোনো অস্তিত্বই রাখেনি। ঘরের আসবাবপত্র লুট করেছে, দরজা-জানালা খুলে নিয়ে গেছে। যা কিছু খুলে নিয়ে যেতে পারেনি সেগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। প্রশাসনের সমর্থনপুষ্ট গণহত্যা থেকে বাঁচতে কয়েক লাখ মুসলমান বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যান। সরকারি হিসাবে ১ লাখ ১০ হাজার। এটা আসলে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয়কারীদের সংখ্যা। যারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বা অন্য রাজ্যে চলে যান তাদের কোনো হিসাব নেই।

রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

শুধু গুজরাট নয়, ভারতের ২৫ কোটি মুসলমান ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা, নৃশংস গণধর্ষণ ও বেপরোয়া অগ্নিসংযোগের মুখে অসহায় ও নিরাপত্তাহীন জীবন অতিবাহিত করছেন। হিন্দুস্থানের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি বিজেপি'র ছত্রছায়ায় মুসলমানদের স্বদেশ ভূমি থেকে বিতাড়নের জঘন্য নীল নকশা বাস্তবায়নে হাত দিয়েছে। আসলে হিন্দুমন জঘন্য; হিন্দু মনে অন্য ধর্মাবলম্বীকে ভালবাসার ও অন্য ধর্মাবলম্বীকে গ্রহণ করার কোন স্থান নেই। মনু সংহিতার সমাজে পরধর্ম সহিষ্ণুতা একেবারে অনুপস্থিত। ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ২ শতাংশ ব্রাহ্মণ বর্ণ বৈষম্যের মাধ্যমে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু বিশেষত বৈশ্য শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও দলিতদের ওপর যেভাবে আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় নিপীড়ন ও বৈষম্য চালিয়ে আসছে তাকে স্থায়ী করার জন্য এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে যাতে নিম্নবর্ণের

২—

হিন্দুরা মাথা তুলতে না পারে তার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে অন্যধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার ও নিন্দাবাদ ছড়ানো হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালানো হয়। মুসলিম হত্যা, নারী ধর্ষণ, দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ, গো-রক্ষা আন্দোলন, রাম মন্দির নির্মাণের অজুহাতে বাবরী মসজিদ ধ্বংসকরণ, মুসলিম বিদ্বেষী প্রপাগান্ডা পরিচালনা ইত্যাদি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনারই অংশ বিশেষ।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী মন্ত্রিসভা গঠনে একজন মুসলমান অথবা একজন শিখকেও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী (Cabinet Minister) হিসেবে নেননি। এতে তাঁর সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও সন্দিগ্ধচিত্ততার পরিচয় মেলে। স্বাধীনতার পর এরকম ঘটনা এই প্রথম। ৭১ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভায় দু'জন মুসলমানকে প্রতিমন্ত্রী (State Mirister) করা হয়েছে মাত্র কোন উপমন্ত্রী (Deputy Minister)ও বানানো হয়নি। আসলে প্রতিমন্ত্রীর নীতি নির্ধারণের কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব নেই। প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে একজন হচ্ছেন জম্মু-কাশ্মীর থেকে ওমর আবদুল্লাহ ও বিহারের কিষানগঞ্জ থেকে শাহনওয়াজ হোসাইন। নীতি নির্ধারণে কেবিনেট মিনিস্টারদের যে বৈঠক হয় সেখানে কোন মুসলমান থাকতে পারবেন না।

১৯৯৯ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হবার পর বিজেপি ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে হিন্দুকরণ এবং ভারতকে শিবাজীর চেতনায় একটি মুসলিম বিদ্বেষী ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্র বানানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নে হাত দেয় এবং এজেন্ডার অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে সংস্কৃতি।

নবগঠিত দলকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরএসএস তিনজন প্রচারক নিয়োগ করে। তারা হচ্ছেন-শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, শ্রী লাল কৃষ্ণ আদভানী ও শ্রী দীন দয়াল উপাধ্যায়। সে দিনের সে প্রচারকগণ আজকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মসনদে আসীন। প্রথম ব্যক্তি ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অশোক নেহরু আরএসএস ও বিজেপির মধ্যকার সম্পর্কের ওপর মন্তব্য করে বলেন, আরএসএস-এর পার্লামেন্টারী শাখা হচ্ছে বিজেপি আর সামাজিক সাংস্কৃতিক শাখা বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দল। তাদের একটি মাত্র উদ্দেশ্য রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা। আশোক নেহরু বলেন ঃ

The RSS's philosophy is that Hindus alone constitue the Indian nation since they ate India's original inhabitants and sole creator of its tolerant socieiy and xulture, that this tolerance has been mistaken as weakness by other later religions. And

those religions are dependent on their future well-being on the Hindus, who must not be trifled with. All Indians will have to abide be the rules laid down be the RSS, which is authori-tarion like other cadre-based fascist parties such as the Nazis in Germany"

অর্থাৎ "আরএসএস-এর দর্শন হচ্ছে একমাত্র হিন্দুদের নিয়ে ভারতীয় জাতি গঠিত যেহেতু তারাই ভারতের আদি অধিবাসী এবং তারাই ভারতের সহিষ্ণু সমাজ ও সংস্কৃতির একমাত্র স্রষ্টা। সহিষ্ণুতাকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা দুর্বলতা হিসেবে ভুল বুঝছে। যেসব ধর্মের ভবিষ্যৎ কল্যাণ হিন্দুদের ওপর নির্ভরশীল তাদের হেলা-ফেলায় উড়িয়ে দেয়া যাবে না। আরএসএস কর্তৃক প্রণীত নিয়ম-কানুন সব ভারতীয়কে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হবে এবং আরএসএস হচ্ছে জার্মানীর নাৎসী বাহিনীর আদলে গঠিত ক্যাডারভিত্তিক ১১ ফ্যাসিস্ট দলের মত প্রভুত্বপরায়ণ। সূত্র ১৯৯৩-এ ওরিয়েন্ট লংম্যান্স থেকে প্রকাশিত অশোক নেহরুর গ্রন্থ খাকী শার্টস অ্যান্ড স্যাফরন ফ্লাগস।

"যতদিন বিজেপি হিন্দুত্ব ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের দর্শনের প্রতি অনুগত থাকবে এবং যতদিন বিজেপি আরএসএস-এর পার্লামেন্টারী শাখা হিসেবে কাজ করে যাবে, ততদিন বিজেপি ও তার মিত্র শক্তি মুসলমান ও অপরাপর নাগরিক যারা গণতন্ত্রের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের কাছে ঘৃণিত ও অভিশপ্তরূপে চিহ্নিত থাকবে।" উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন ভারতীয় লোকসভায় প্রাক্তন সাবেক শাহাবউদ্দীন।

সূত্র : সৈয়দ শাহাবউদ্দিনের গ্রন্থ 'দি মুসলিম ইন্ডিয়া', দিল্লী, নভেম্বর ১৯৯৯।

গোপন কর্মসূচি

ক্ষমতাসীন বিজেপির গোপন কর্মসূচির কৌশল ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে বিশেষত গুজরাট ও উত্তর প্রদেশে, যেখানে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন রয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রকে তারা দলীয়করণের নেশায় বিভোর। শংকর ভারতীয় নামে আরএসএস-এর আরেকটি ফ্রন্ট উত্তর প্রদেশে ভারতীয় পৌত্তলিক সংস্কৃতি মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে চলেছে। স্কুল পাঠ্যবই এমনভাবে তৈরি হচ্ছে, যাতে সংখ্যালঘু মুসলিম, বৌদ্ধ ও খৃস্টান ধর্ম ও ধর্মাবলম্বী সম্পর্কে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় মুসলমানদের হিন্দু বানানোর যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার তালিকা দীর্ঘ। নয়া দিল্লীর জওয়াহের লাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কান্তি বাজপেয়ী ধর্মীয়

উন্মাদনা ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সৃষ্টি এবং হিন্দু মৌলবাদের বিকাশের বেশ কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছেন তার সুলিখিত এক প্রবন্ধে

(ক) ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু রথযাত্রার আয়োজন;

(খ) ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদের ধ্বংস সাধন;

(গ) বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর মুম্বাইতে মুসলমানদের প্রতি আক্রমণ অভিযান;

(ঘ) ক্রিকেট পিচের ধ্বংসযজ্ঞ;

(ঙ) খ্রিস্টান ধর্মযাজক ও শিশুদের প্রতি আক্রমণ ও জীবন্ত দগ্ধিভূত করা;

(চ) দিল্লী পুলিশ কর্তৃক খ্রিস্টানদের তালিকা প্রস্তুতকরণ;

(ছ) সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের (আল্লামা আলী মিয়া নদভী) প্রতি হুমকি প্রদর্শন;

(জ) বিদ্বেষপূর্ণ পাঠ্যবই নতুনভাবে প্রস্তুত করা;

(ঝ) দিল্লীস্থ স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় পড় য়া ভারতীয় মেয়েদের পাশ্চাত্য পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ করা;

(ঞ) উত্তর প্রদেশে নতুন মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণে বিধি-নিষেধ আরোপ;

(ট) সংবিধানের ৩৭০ ধারা লঙ্ঘন করে সরকারি কর্মচারীদের আরএসএস-এর সদস্যভুক্তির জন্য চাপ প্রয়োগ;

(ঠ) আরএসএস বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের মত ভীতি প্রদর্শনকারী সংগঠনের প্রতি রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য প্রদান। তথ্য সূত্র ডঃ মোজাম্মেল হক, এম ডব্লিউ আই জার্নাল, মক্কা, ভলিউম, ২৮ এপ্রিল ২০০২. পৃ-১৩। উপরোক্ত তালিকা ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বিনাশী সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার পার্শ্বচিত্র মাত্র। ১৯৯২ সালের ২৫ জানুয়ারি 'টাইমস' পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে ১৯৭৪ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এ ১৮ বছরে কেবলমাত্র মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে ১৩ হাজার ৯০৫টি।

বংশপরম্পরায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী উগ্র বুদ্ধিজীবীদের আক্রোশপূর্ণ বক্তব্যের ফলে হিন্দু-মুসলিমের মাঝে বিভেদের প্রাচীর তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। আগামীতেও যাতে তা অব্যাহত থাকে বর্তমানে তার উদ্যোগ চলছে। নাট্য ও চলচ্চিত্র অভিনেতা এবং কলামিষ্ট আরিফুল হক বলেন ভারত এখন মানুষ তৈরি না করে প্রতিটি ভারতীয় শিশুকে আদভানী, বাজপেয়ী, বালথ্যাকার হিসেবে গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যাভারতী ও শিশু মন্দির নামে গড়ে তোলা হয়েছে ১৪ হাজার স্কুল। সেই স্কুলগুলোর লক্ষ্য একটিই এবং তাহল নতুন প্রজন্মকে এমনভাবে গড়ে তোলা যে, তারা যেন ভারত থেকে সর্বজাতি বিশেষ করে দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি মুসলিমদের নির্মূল করে, কট্টর হিন্দু ভারত নির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

ভারতীয় সাংবাদিক ও রাজনীতিক সাইয়েদ শাহাবউদ্দিন হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির চিত্র তুলে ধরে বলেন The BJP created a communal cnvironment in which a Muslim Indian becomes a helpless spectator, when his graveyeard is occupied, when he is prevented from building a mosque on his own Iand, when his religion, his Holy prophet and the Holy Quran are vilifed in print and in words, when he is forced to build a Hanuman Temple for a monky he accidentally kills, when his Madrasah as dens of ISI (pakistan's Inter services Intelligence)"

অর্থাৎ "বিজেপি ভারতে জন্ম দিয়েছে সাম্প্রদায়িক পরিবেশের, যেখানে তাদের কবরস্থান জবরদখল করা হয়; যেখানে নিজস্ব জায়গায় মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণে বাধা দেয়া হয়; যেখানে তাঁর ধর্ম, তাঁর পয়গাম্বর ও পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে অপবাদ ও কলংক আরোপ করা হয়; যেখানে দুর্ঘটনাক্রমে একটি বানর হত্যার ফলে তাকে হনুমান মন্দির তৈরি করতে বাধ্য করা হয়; যেখানে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর আখড়া হিসেবে মসজিদ-মাদ্রাসা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়, সেখানে একজন ভারতীয় মুসলমান অসহায় দর্শক হয়ে পড়ে।

ভারতের নিম্নবর্ণের হিন্দু যারা সামাজিকভাবে দলিত নামে পরিচিত তাদের মুখপত্র 'দলিত ভয়েস' সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় মুসলমানদের হিন্দু বানানোর বিবরণ ছেপেছে। পত্রিকাটির "ভারতীয় মুসলমানদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার হিন্দু নাৎসী পরিকল্পনা" শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়

"গুজরাটের পাঠ্যপুস্তকে মুসলমানদের বহিরাগত আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে ঘৃণার জন্ম দেয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে (ভারতীয় নাগরিক হিসেবে বসবাসকারী) বাঙালি মুসলমানদের বহিরাগত বাঙালি বা বাঙালি মুসলমান হিসেবে উল্লেখ করে ভোটার তালিকায় নাম উল্লেখ করা হচ্ছে না। কোথাও আবার আইএসআই-এর চর, সন্ত্রাসী, চোরাকারবারী, দাগী আসামি, মৌলবাদী প্রভৃতি দুর্নাম রটিয়ে মুসলমানদের অধিকার বঞ্চিত এমনকি ভোটাধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে।"

উদ্ধৃতি ঃ ইনকিলাব, ২২ জুন ২০০২ ॥ অধ্যাপক আ.ফ.ম খালিদ হোসেন।

ভি.টি. রাজশেখর-এর নিবন্ধ

অমানবিক

জন্মসূত্রে আমি হিন্দু, উচ্চবর্ণের শূদ্র; কিন্তু বিগত দশ থেকে পনের বছরের পড়াশোনা, অভিজ্ঞতা, দলিত আন্দোলনের সঙ্গে আমার সংযুক্তির ফলে আর আমি হিন্দু নই। আমি মানুষ। হিন্দু মানুষ হতে পারে না।

যে কোন সমাজের উন্নতি সমাজস্থ মানুষের মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে। ভারতীয় হিন্দু যে ধ্বংসাত্মক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা শুধু বিপজ্জনক নয়, প্রকৃতপক্ষে অমানবিক। বস্তুত এ হলো তাদের অসার ধর্মেরই অনিবার্য কুফল। সৌভাগ্যবশত নিম্নবর্ণ এবং আদিবাসীদের একটা বিরাট অংশ এই ভ্রান্ত মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি; কারণ তারা গোপ্রসূত হিন্দু নয়। কিন্তু ভারতে দণ্ডমুণ্ডর আর্বিভাবক শ্রেণীরূপে ব্রাহ্মণরা তাদের প্রচার মাধ্যম, তাদের লেখা ইতিহাস, তাদের নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রায় সমগ্র জনমানসকে প্রভাবিত করেছে। যেহেতু ভারতের মোট জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এবং সত্তর শতাংশেরও অধিক লোক সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই এই কারসাজি সহজতর হয়েছে। ভারতীয়রা বর্তমানে যান তা হতে পেরেছে। কারণ ভারতের প্রায় আশি শতাংশ লোক অসহিষ্ণু হিন্দু ধর্ম এবং এর বিপজ্জনক জনবিরোধী মূল্যবোধগুলো অনুসরণ করছে। হিন্দু ধর্মের সঠিক নাম হল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, যেটা আর্য অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে এসেছিল। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম হিসেবে পরিগণিত হিন্দু ধর্মের সঙ্গে অন্য কোন ধর্মের তুলনা করা কঠিন।

অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং স্ববিরোধী মনে হলেও এ কথা ঠিক যে, হিন্দুদের সংস্কৃত পবিত্র ধর্ম গ্রন্থগুলোতে হিন্দু ধর্ম, হিন্দু বা হিন্দুস্থানের মত কোন শব্দ পাওয়া যায় না। এমনকি এই সমস্ত গ্রন্থে এই ধর্মকে বিশেষ কোন নামে চিহ্নিত পর্যন্ত করা হয়নি। এর কোন প্রতিষ্ঠাতা নেই। এর না আছে চার্চ, না আছে বাইবেল বা কোরআনের মত কোন ধর্মগ্রন্থ।

হিন্দু কে? এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র নেতিবাচক দিক থেকে দেওয়া সম্ভব ঃ যে মুসলিম, খ্রিস্টান অথবা ফার্সি নয় সেই হিন্দু। হিন্দু সন্তরা বিশ্বের অতুলনীয়। তারা শুধুমাত্র একটি জাতভুক্ত (ব্রাহ্মণ) এখন নয়, তাদের পদ বংশানুক্রমিকও । প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ হিন্দু তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম জানে না। এদের অধিকাংশই ম্লেচ্ছ-অস্পৃশ্য, যারা নিয়মিত মন্দিরে যায় না। অন্তত ত্রিশ শতাংশ হিন্দুর হিন্দু মন্দিরগুলোতে প্রবেশাধিকার নেই।

সুতরাং একমাত্র জন্মসূত্রে যে হিন্দু তাকেই আমরা হিন্দু বলতে পারি, এছাড়া হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞা দেয়া যায় না ঃ এই মানদণ্ড অনুযায়ী সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী হিন্দু নয়। অস্পৃশ্যতা জাত-ব্যবস্থারই অংশবিশেষ এবং এই জাত-ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে হিন্দু ধর্ম। যদি জাতি ব্যবস্থার অবসানো ঘটান হয়, তবে হিন্দু ধর্মও তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং প্রত্যেক হিন্দুর একটা জাতগত অস্তিত্ব থাকতেই হবে। জাত ব্যতিরেকে হিন্দুর কোন অস্তিত্ব নেই। অন্যভাবে বললে, হিন্দু ধর্মের আর এক নাম জাত প্রথা। জাত এবং অস্পৃশ্যতা অবিনশ্বর, কারণ এদের পিছনে আছে ঐশী অনুমোদন। এমনকি, হিন্দু দেবতাদেরও জাতগত অস্তিত্ব আছে এবং এই দেবতারা জাতগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে।

এক কথায় বলা যায়, হিন্দু ধর্ম হল একটা বিরাট পাগলাগারদ, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পাগলদের আখড়া। এই কারণেই ভারত এক রুগন্ দেশ এবং তার এই রুগন্‌তা অন্যান্য জাতিকেও প্রভাবিত করছে। শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ব্রিটেন, কানাডা প্রভৃতি দেশেও এই প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে আসল হিন্দু ধর্ম পালন করে একমাত্র ব্রাহ্মণরা, যারা জাত-পিরামিডের একেবারে শীর্ষে অবস্থান করছে। যদিও তারা সমগ্র হিন্দু জনগোষ্ঠীর পাঁচ শতাংশও নয়, তবুও মর্তে ঈশ্বরের মত তারাই সব কিছুর অর্থাৎ সব সম্পত্তি এবং সুযোগ-সুবিধার নিয়ন্তা, সর্বোপরি তারা জনমানসকেও নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং যথার্থ কারণে তারা ভারতের শাসক শ্রেণী, স্বাধীনতার পর থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং আধা-ব্রাহ্মণ রাজীব গান্ধীসহ সকল প্রধানমন্ত্রীই (অতি স্বল্পকালের একটা ব্যতিক্রম ছাড়া) কাঞ্চির শংকরাচার্যের অনুমোদন পাবার পরই ক্ষমাতাসীন হন।

হিন্দু ধর্ম (যার বৈজ্ঞানিক নাম ব্রাহ্মণ ধর্ম) ব্যক্তিগত ধর্মান্তরে বিশ্বাস করে না। হিন্দু ধর্ম বহু ধর্মকে গ্রাস করেছে। এই ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম এবং মহাবীরের শৈব ধর্মকেও গ্রাস করেছে। কিন্তু যখন হিন্দু ধর্ম শিখ ধর্মকে গ্রাস করার চেষ্টা করেছিল তখন সর্দারজীরা এতে বাধা দিয়েছিল এবং এতে ব্রাহ্মণরা ক্ষিপ্ত হয়ে স্বর্ণ-মন্দিরে সেনা পাঠিয়ে হাজার হাজার শিখকে হত্যা করে তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে আর শিখরা ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করে এর পাল্টা জবাব দিয়েছে। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন জাতের পক্ষে ভারতকে শাসন করা সম্ভব নয়। হিন্দু ধর্মই ব্রাহ্মণদের এই বিশেষ ক্ষমতা দান করেছে।

হিন্দু ধর্ম এত শক্তিশালী যে, বিদেশী ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও এটা সর্বাপেক্ষা উদার বৌদ্ধ ধর্মসহ সকল প্রতিবাদী আন্দোলনগুলোকে গ্রাস করেছে। বৌদ্ধ ধর্মকে দু'হাজার বছর আগে ভারত থেকে উৎখাত এবং ধ্বংস করা হয়েছে। শংকরাচার্যের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আক্ষরিক অর্থে নিধন

করেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে আজও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব আছে, কিন্তু ভারতে এর কোন অস্তিত্ব নেই; একমাত্র ব্যতিক্রম ডঃ বি. আ. আম্বেদকার। অন্তজদের ত্রাতা এবং ভারতের এক নতুন উদীয়মান তারকা ডঃ আম্বেদকার লক্ষ লক্ষ অন্ত্যজদের সঙ্গে নিজেও তাঁর জীবনের শেষপর্বে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

হিন্দু ধর্মকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন প্রয়াস চলছে। সরকার নিজেই খ্রিস্টান ও মুসলিমদের ভয় দেখিয়ে এবং নিজেদের হিন্দুপ্রীতির কথা প্রকাশ করে এ ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা করছে। হিন্দু মৌলবাদী (ফ্যাসিবাদী) দল 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ' (আরএসএস) সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালাতে সক্রিয় ইন্ধন যোগাচ্ছে এবং মাঝে মধ্যে অন্ত্যজ, আদিবাসী, মুসলিম, খ্রিস্টান এবং এখন শিখদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। আরএসএস-এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হল শ্রেণী-জাতিভিত্তিক ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র ম্লান করে দেবে, যা অন্ত্যজদের বিনাশ এবং সংখ্যালঘুদের নপুংসক করে রাখতে চায়। আরএসএস কেরালায় মার্কসবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই কয়েকশ' লোককে হত্যা করেছে। ব্রাহ্মণরা আবার দুটো দলে বিভক্ত। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা আরএসএসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রগতিশীল যারা, তারা কমিউনিষ্ট দলসহ অন্য 'জাতীয়' দলগুলোকে নেতৃত্ব দেয়। ব্যাপারটা এই রকম, যে দলই ভোটে জিতুক না কেন, দেশ শাসনের ভার একমাত্র ব্রাহ্মণদের ওপরই অবধারিত ন্যস্ত হয়।

অন্ত্যজ এবং আদিবাসীরাই, যারা ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এই প্রাচীন দেশটির আদি বাসিন্দা। কিন্তু আর্যরা এ দেশে এসে এদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। এদের মধ্যে যারা পাহাড়ে-জঙ্গলে পালিয়ে বেঁচেছিল পরবর্তীকালে হয়েছে আদিবাসী এবং যারা ধরা পড়েছিল ও গ্রামের বহিঃসীমানায় যাদের স্থান হয়েছিল তারাই হল অন্ত্যজ।

অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক শুধু অন্ত্যজদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ঋতুকালীন সময়ে মেয়েরাও অস্পৃশ্য হয়ে যায়। বস্তুত সম্মানের ঊর্ধ্বক্রম এবং অবমাননার অধঃক্রম অনুযায়ী এক বর্ণের হিন্দু অন্য বর্ণের কাছে অস্পৃশ্য। কিন্তু এখানে হরিজন'রা গান্ধীজীর ভাষায় যার অর্থ ঈশ্বরের সন্তান– শুধু অস্পৃশ্যতার জ্বালাই ভোগ করে না, তারা অবাঞ্ছিত, দর্শনের অযোগ্য, তাদের ছায়া অপবিত্র এবং তাদের কথা আলোচনা ও চিন্তা করারও অনুপযুক্ত। হিন্দু বাড়িতে কুকুর-বিড়ালের স্থান হয়, কিন্তু অন্ত্যজদের নয়।

সেজন্যই হিন্দু ভারতের প্রতিটি গ্রাম গেটো অঞ্চলে (প্রধানত ইতালীর শহরে ইহুদিপাড়া, ইহুদিদের এই অঞ্চলের বাইরে যেতে দেয়া হয় না) পরিণত হয়েছে। জন্মগতভাবে যারা ক্রীতদাস, যারা বিনিময়ে কোন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না রেখে হিন্দুদের বেগার খাটবে বলে ধরে নয়া হয়, তাদের স্থান গ্রামের সবচেয়ে

এই ওঁচা জায়গাগুলোতে। এরাই সবরকমের নীচ কাজগুলো করে- যেমন ঝাড় দেয়া, জঞ্জাল সাফ করা, চর্ম সংস্কার, কৃষিকর্ম, মৃত গবাদি পশু সংস্কার, মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি। এরাই হয় নাপিত, ধোপা, চর্মকার, ঘরামি। সমস্ত নোংরা কাজ এদেরই করতে হয়। পুরুষরা অন্ত্যজ হলেও অন্ত্যজ মেয়েদের উপভোগ করার ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কোন বাধা নেই। এটাই হিন্দু ন্যায়বিচারের ধারণা। হিন্দু মন্দিরগুলোতে আছে ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত অসংখ্য কুমারী দেবদাসী, শব্দগত অর্থে এরা হল মর্তের ভগবান। হিন্দু ধর্মে সমাজবাদের কোন স্থান নেই। কিন্তু এ দেশের সংবিধান সরকারকে কিছু ক্ষেত্রে সমাজবাদী সংস্কার প্রবর্তন করতে বাধ্য করেছে। সুতরাং তীব্র বৈপরীত্য এবং ফ্যাসিবাদী হিন্দু মতাদর্শ ও সরকারের সমাজবাদী স্লোগানের মধ্যকার অন্তহীন দ্বন্দ্বের মধ্যে আমরা বেঁচে আছি। দেশের সংবিধান অন্ত্যজদের চাকরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে কাগজে-কলমে 'সংরক্ষণের' ব্যবস্থা করেছে।

হিন্দুদের অস্পৃশ্যতার অমানবিকতা এক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা বিশ্বের অন্য কোন অংশে বিরল। অন্য কোন সমাজে আদিম, প্রাচীন অথবা আধুনিক এর নজির নেই। ভারতের তাবৎ সাংবাদিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকরা অন্ত্যজদের সমস্যা বা জাত ব্যবস্থার বিধ্বংসী চরিত্র সম্পর্কে আগ্রহী নন, কারণ তারা সকলেই উচ্চবর্ণের সন্তান এবং তাদের এই জাত-পরিচয় সমাজের উচ্চপদগুলো অধিকার করতে সাহায্য করেছে। সুতরাং কেন তাঁরা এর সমালোচনা করবেন?

ব্রাহ্মণ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন বুদ্ধ এবং অন্ত্যজরা একে গণচরিত্র দান করেছিল। ডঃ বি আর আম্বেদকার দাবি করছেন যে, আর্যরা ভারতে অনুপ্রবেশ করার আগে ভারতের মূল ভাষা ছিল তামিল। তিনি বলছেন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে সংঘর্ষে বৌদ্ধরা পরাজিত হয় এবং তাদের গ্রামের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। বৌদ্ধ ধর্মের শত্রু ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধ ধর্মে অনুপ্রবেশ করে এই ধর্মের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত চালানোর কূট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় দিক থেকেই এরা বৌদ্ধ নিধনযজ্ঞের তত্ত্বাবধান করেন। বৌদ্ধরা পরাজিত হলে আর্যরা এই পরাজিত বৌদ্ধদের ওপর অস্পৃশ্যতা চাপিয়ে দিল।

বৌদ্ধ ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য ব্রাহ্মণরা আরও একটি অভিনব কৌশল অবলম্বন করল ঃ তারা গো-মাংস খাওয়া ছেড়েছিল এবং কঠোরভাবে নিরামিষ ভোজন শুরু করল। গো-মাংস ভোজনে ব্রাহ্মণরাই ছিল অতি উৎসাহী এবং বৈদিক গ্রন্থে তাদের নির্বিচারে গো-হত্যা এবং গো-মাংস ভোজনের উল্লেখ আছে। হত্যা করে তারা আনন্দ পেত। বস্তুতপক্ষে ব্রাহ্মণরা ছিল সর্বগ্রগামী।

ব্রাহ্মণরা গো-মাংস বর্জন করলে অন্য হিন্দুরাও তাদের অনুসরণ করল। যদি অ-ব্রাহ্মণরা গো-মাংস বর্জন করে একটি বিপ্লব সমাধা করে থাকে, তবে ব্রাহ্মণরা দুটি বিপ্লব সমাধা করেছিল। এই সর্বপ্রথম তারা মাংস ভক্ষণ ছেড়ে দিল, তারপর হল নিরামিষাশী, আমার মতে। এই কারণে ব্রাহ্মণ গো-মাংস বর্জন করে গো-উপাসনা শুরু করেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ ধর্মের বিবাদ এবং বৌদ্ধ ধর্মের ওপর ব্রাহ্মণ ধর্মের আধিপত্য বিস্তারের কৌশলের মধ্যেই গো-পূজার রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়। [ডঃ আম্বেদকার, অন্ত্যজ (আনটাচেব্‌লস), পৃঃ ১৫১]

জীবনের সর্বোত্তম সুখ (গো-মাংস ভক্ষণ) ত্যাগ করার মতন হঠকারী রোমাঞ্চকর সিদ্ধান্ত কেন ব্রাহ্মণরা নিয়েছিল? আম্বেদকার বলছেন ঃ বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবের ফলে হিন্দু ধর্মের মহিমার যে ক্ষতি হয়েছিল তা পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রাহ্মণদের নিরামিষাশী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৫৪)

যে ব্রাহ্মণরা বিশ্বের সকলকে চাতুরী, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতায় হার মানিয়েছে তারা চরম পথেই চরমপন্থার বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চেয়েছিল। এটা একটা চমৎকার কৌশল। বৌদ্ধ ধর্মকে পরাজিত করার একমাত্র পথ ছিল এর থেকে নিরামিষ ভোজন করা। আজকের ব্রাহ্মণরা (কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গ বাদে) খাঁটি নিরামিষাশী এবং মদ্যপানবিরোধী। অহিংসা ব্রাহ্মণ ধর্মের অঙ্গীভূত হল এবং তা বৌদ্ধ ধর্মের পরাজয়ের দিন থেকেই হিন্দু ধর্ম হিসেবে পরিচিত হল। ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য এবং বৌদ্ধ ধর্মের বৈপ্লবিক দর্শন আর প্রাক-আর্য যুগের আদিবাসী সমাজের খাঁটি গণতন্ত্র ও নারী প্রাধান্যের অবসানের জন্য বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ ধর্মকে বর্জন করা হয়েছিল এবং এভাবেই তারা ভারতকে স্থায়ী দাসত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এভাবে বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ ধর্মের জয়ের ফলে পৃথিবীর বৃহত্তম কিন্তু সর্বাধিক অনাহারক্লিষ্ট গবাদিপশুর দেশ ভারত ক্রমে গো-উপাসকে রূপান্তরিত হল। এভাবেই ব্রাহ্মণরা তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছিল।

ব্রাহ্মণদের এই চূড়ান্ত ত্যাগ প্রমাণ করে যে, তারা ব্রাহ্মণ ধর্ম রক্ষার্থে যে কোন চরম পথ অনুসরণ করতে এবং যে কোন ধরনের আপস করতে প্রস্তুত। এমনকি আরএসএস-এর দার্শনিক গুরু গোলওয়ালকার স্বীকার করেছেন যে, হিন্দুরা প্রত্যেক বিদেশী অনুপ্রবেশকারীকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর প্রতিরোধ নেয়ার জন্য। তাদের কাছে ভারত নয়, ব্রাহ্মণ্যবাদই ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাদের স্বকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা সমস্ত বিদেশী অনুপ্রবেশকারীকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। ব্রাহ্মণ ধর্মের কারণেই ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র (বিশ্ব ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারত বিশ্বের একাদশতম দরিদ্র দেশ) এবং দুর্বল জাতি। শুধু অন্ত্যজদের নয়,

ভারতকে বাঁচাতে হলেও ব্রাহ্মণ ধর্মকে ধ্বংস করতে হবে। এ কারণে অন্ত্যজ এবং আদিবাসীরা ভারতের প্রকৃত অধিকারী হয়েও ব্রাহ্মণ ধর্মের অত্যাচার থেকে পালিয়ে বাঁচার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

আরএসএস পরিচালিত হিন্দু মৌলবাদীরা এখন প্রায়শই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গুণগান করে। হিন্দুদের মধ্যে জাতীয় দেশাত্মবোধ জাগানোর জন্য তারা প্রচুর অর্থ এবং সময় ব্যয় করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল ঃ ভারতীয়দের কি একটি জাতি বলা চলে?

মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ প্রভৃতি স্বতন্ত্র ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো একটা পৃথক, কিন্তু অন্তঃহীনভাবে বিবদমান জাতির জন্ম দিয়েছে। মুসলিম (১৫ শতাংশ) খ্রিস্টান (৩ শতাংশ) এবং শিখ (২- শতাংশ) সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছে। এছাড়া অন্ত্যজ (২০ শতাংশ) এবং আদিবাসী (১০ শতাংশ) এরা প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক জাতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। শিখরাও একটা জাতি। আবার হিন্দু ধর্মে প্রতিটি বর্ণই (Caste) এক একটি পৃথক জাতি (nation) গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জাতি (nation) হল জীবিত আত্মা; আত্মিক সত্তা। আনন্দের চেয়ে যৌথ দুঃখ ভোগ ঐক্যের শক্তিশালী যোগসূত্র। জাতীয় স্মৃতির ক্ষেত্রে বিজয়ের চেয়ে শোকই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তা কর্তব্য আরোপ করে এবং যৌথ প্রচেষ্টা দাবি করে। [পটস অন পাকিস্তান (থ্যাকার এণ্ড কোং দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৫, পৃঃ ১৭) বইতে ডঃ আম্বেদকার কর্তৃক উদ্ধৃত রেনার মন্তব্য]

সাক্ষরতা এবং অন্যান্য ঘটনার প্রভাবে চেতনার বৃদ্ধি হওয়ায় মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ এবং হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত সকল জাতি স্বাতন্ত্র্যের দাবিতে বিক্ষোভ করছে এবং অনেকেরই আশঙ্কা যে, একসময়ে ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ব্রিটিশরা ভারতে আসার আগে বহু 'জাতি' এই উপমহাদেশে বাস করত। ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে যাওয়ার পর আমরা বিভাজিত হয়েছি। (পাকিস্তান, বাংলাদেশ) এবং ভবিষ্যতে আবারও বিভাজিত হব, কারণ হিন্দু ধর্ম ঘৃণারই প্রচার করে।

ভারতের অন্ত্যজরা জাত-বিদ্বেষের চরম বৈষম্যের কদর্যতার শিকার হয়ে পড়েছে। নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গ বাড়িতে চাকর হিসেবে নিযুক্ত হয়; তারা অন্ত্যজ নয়। কিন্তু অস্পৃশ্যদের সব জায়গা থেকেই দূরে সরিয়ে রাখা হয় ঃ তাদের স্পর্শ, দৃষ্টি, এমনকি চিন্তা-ভাবনাও দূষণের কারণ। একজন 'কৃষ্ণাঙ্গ' মানুষকে তার পায়ের রঙ দিয়ে চেনা যায়, কিন্তু অন্তজ্যজকে নয়। ব্রাহ্মণের তুলনায় অন্ত্যজের রঙ পরিষ্কার হতে পারে। তাই গায়ের রঙ দিয়ে শনাক্ত করা যায় না।

সেই কারণে কৃষ্ণাঙ্গ সমস্যার মত ভারতীয় অস্পৃশ্যতার কারণ বর্ণান্ধতা নয়। এটা জাত ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত এক কলুষযুক্ত মানসিক সমস্যা। এই জাত প্রথাই একে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব সমস্যায় পরিণত করেছে। কিন্তু কোন বিশ্ব

সংস্থা-রাষ্ট্রপুঞ্জ, আন্তর্জাতিক বিচারালয়, মানবাধিকার কমিশন বা অন্য কোন সংস্থাই অন্ত্যজদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়নি, যদিও এদের সংখ্যা আমেরিকার নিগ্রো অথবাপ প্যালেস্তিনীয় অথবা অন্যান্য সংগ্রামী গোষ্ঠীকে ছাড়িয়ে গেছে। সেই কারণে এটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রগণ্য বিশ্ব সমস্যা।

বিশ্বের অন্য সমস্ত দেশ (কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ব্যতীত) ধনী ও দরিদ্র এই দু'ভাগে বিভক্ত (মার্কসীয় অর্থে), কিন্তু ভারতে ধনী ও দরিদ্রের পাশাপাশি উচ্চ ও নিম্ন জাতের মধ্যে বিভাজন দেখা যায়। অর্থাৎ ভারতে শুধু ধনী ও দরিদ্রের আনুভূমিকা বিভাজন নয়, উচ্চ ও নিম্ন জাতের বিভাজনও দেখা যায়; একটি অপরটির সঙ্গে সংলগ্ন। অর্থাৎ উঁচু জাতভুক্ত ব্রাহ্মণ দরিদ্র হতে পারে আবার জগজীবন রামের মত একজন অন্ত্যজ মন্ত্রী ধনী হতে পারেন। পৃথিবীর অন্য কোন দেশ এই ধরনের বিভ্রান্তিকর সমস্যার সম্মুখীন হয়নি।

অন্য দেশগুলো শ্রেণী পাশে বদ্ধ কিন্তু ভারত শ্রেণী ও জাত উভয় প্রকার অভিশাপের শিকার। যেহেতু ধনী এবং দরিদ্র উভয়েই প্রাথমিক আনুগত্য তাদের জাতের প্রতি, তাই একই জাতের দরিদ্রদের ধনীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা এক দুরূহ কাজ। ভারতের অবিরাম জাত সংঘর্ষগুলো চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছে যে, দরিদ্র হিন্দুরা আর্থিকভাবে দরীদ্র হলেও নিম্ন জাতের লোকদের সাথে হাত মেলাবে না। জাত এবং ভাষাগত বিভাজন ছাড়াও নারী-পুরুষ বৈষম্যও ভারতের বৈশিষ্ট্য। ভারতের নারীদের কোন অবস্থানকর মর্যাদা নেই।

তাই ভারতের এই জটিল পরিস্থিতিতে দরিদ্রদের ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এভাবেই হিন্দু-প্রধান ভারতে মার্কসের পরাজয় ঘটেছে। এমনকি বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং শিখ ধর্মও জাত বিভাজনের হাত থেকে রেহাই পায়নি, কারণ শুরুতে এরা সকলেই হিন্দু ধর্মভুক্ত ছিল।

ভারতে জাতই শ্রেণী– আমাদের এই মত সমাজতাত্ত্বিকরা মোটামুটি অনুমোদন করেছে। (দি ডিলেমা অফ ক্লাস অ্যান্ড কাস্ট-ভি টি. রাজশেখর-ডিএসএ, ১৯৮৪, ১০৯/৭ম ক্রশ, প্যালেস লোয়ার অরচার্ডস, বাঙ্গালোর-৫৬০০০৩)। চলমান জাতই শ্রেণী। সাধারণভাবে সমস্ত উঁচু জাতের লোকেরাই ধনী এবং নীচু জাতের লোকেরা দরিদ্র। দৃঢ়তার সঙ্গেই একথা বলা যায় যে, ভারতে বিনাশ ব্যতীত শ্রেণী সংগ্রাম পরিচালিত করা সম্ভব হবে না। অন্তত যুগপৎভাবে শ্রেণী জাতভিত্তিক সংগ্রাম শুরু করা দরকার। কিন্তু মার্কসবাদী কমরেডরা আমাদের সঙ্গে একমত নন। হিন্দুরাও এর জন্য প্রস্তুত নয়। যেহেতু জাত ব্যবস্থার আর একনাম হিন্দু ধর্ম, তাই জাতের ওপর যে কোন আক্রমণের অর্থ হবে জাত প্রথাসঞ্জাত সম্পত্তি ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার ওপর

আঘাত। কোন হিন্দু জাত ব্যবস্থাকে বর্জন করতে রাজি নয়, কারণ প্রতিটি জাত এবং উপজাত এই বিশেষ ব্যবস্থা থেকে কিছু না কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করে থাকে।

অন্ত্যজরা বিপুলভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা ব্যাপক শোরগোল তুলেছিল। এই ধর্মান্তরণকে বাধা দেয়ার জন্য তারা অস্পৃশ্যতা দূর করার কথা বলেছিল। এম.কে. গান্ধীসহ হিন্দু নেতৃবৃন্দ তাদের অস্পৃশ্যতা অবসানের বাসনার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু কেউই জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি। কারণ তারা জানতেন যে, যেহেতু অস্পৃশ্যতা জাত ব্যবস্থার অঙ্গ তাই জাত ব্যবস্থার অবসান না ঘটিয়ে অস্পৃশ্যতার অবসান সম্ভব নয়, আর তার অর্থ হবে হিন্দু ধর্মের অবসান। অর্থাৎ এম.কে. গান্ধী এবং অন্যান্য হিন্দু নেতৃবৃন্দ যখন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন তখন তারা এ ব্যাপারে খুব একটা আন্তরিক ছিলেন না। গান্ধী (আম্বেদকার যাকে হিন্দু নেতা এবং অন্ত্যজদের পয়লা নম্বর শত্রুরূপে বর্ণনা করেছিলেন) শুধুমাত্র একটা জোড়াতালি দেওয়া সমাধান চেয়েছিলেন। গান্ধী সামান্য সংস্কারেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু আম্বেদকার চেয়েছিলেন বিপ্লব এবং তিনি দলিতদের হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করতে ও ধর্মান্তরে আগ্রহী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ভারত বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ, তাই বিপ্লবের সকল প্রয়োজনীয় শর্ত এখানে বিরাজমান। মার্কসবাদী দলগুলো পঞ্চাশ বছরেরও পুরনো এবং এদের শক্তিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু দেশের কোন অংশেই বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। কারণ মার্কসবাদী নেতৃত্ব ব্রাহ্মণদের করায়ত্ত, যারা জাত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য কোন সংগ্রাম করতে আদপেই আগ্রহী নয়, যেহেতু এটা তাদের জাত প্রথাসঞ্জাত সম্পত্তি এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ওপর আঘাত হানবে। জাত ব্যবস্থাকে ধ্বংস না করে শ্রেণীর বিলোপ সাধন সম্ভব নয়। তারা জাতগত সংগ্রামের সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামকে যুক্ত করতে রাজি নয়।

অন্ত্যজ এবং আদিবাসীরা জন্মবিপ্লবী। অন্য কোন গোষ্ঠীই এদের মত বিপ্লবের জন্য আগ্রহী নয়। কিন্তু এদের আকর্ষণ করার মত কোন কর্মসূচি মার্কসবাদীদের নেই। বামপন্থী দলগুলো এই বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোকে উৎসাহিত করে না এবং এদের অনেকেরই ধারণা যে, ভারতে মার্কসবাদীরা আদৌ বিপ্লবী নয়, প্রকৃতপক্ষে এরা প্রতিবিপ্লবী।

মার্কসবাদীরা যেহেতু বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাই অন্ত্যজদের কাছে সমাধানের অন্য একটি পথ-ধর্মীয় সমাধান গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেই জন্যই হাজার হাজার অন্ত্যজ এবং আদিবাসী খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং এই ঝোঁক ক্রমবর্ধমান।

উল্লেখ্য, ভারতে অন্ত্যজরা অত্যাচারের শিকার হয়েছে তার কারণ এই নয় যে, তারা দরিদ্র। ভারতের বিপুলসংখ্যক দরিদ্র জনগণের মধ্যে অস্পৃশ্যরা একটা অংশ মাত্র। এদেশের পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশী মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। তাহলে কেন কেবলমাত্র অন্ত্যজরাই অত্যাচারের শিকার? এর কারণ তাদের অপমানজনক সামাজিক মর্যাদা, দারিদ্র্য নয়। সুতরাং ভারতে শোষণ এবং দারিদ্র্যের মত সমস্যার উৎস সামাজিক, আর্থনৈতিক নয়। অর্থাৎ ভারতে দারিদ্র্যের সর্বপ্রথম কারণ হল সামাজিক এবং অর্থনীতি এর দ্বিতীয় কারণ।

অন্ত্যজদের সামাজিক অবমাননার পশ্চাতে যেহেতু হিন্দু ধর্মের অনুমোদন রয়েছে, তাই হিন্দু ধর্মের গ্যাস চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে অন্য কোন উদার ধর্মের যেমন খ্রিস্টান, ইসলাম, শিখ, বৌদ্ধ ইত্যাদির ছায়ায় মুক্ত বাতাস খোঁজা ছাড়া অন্ত্যজদের কোন উপায় নেই। সে কারণে অন্ত্যজ এবং শূদ্রদের মধ্যে ধর্মান্তর বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, খ্রিষ্টান বা ইসলাম ধর্ম ধর্মান্তরিত হলে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হবে। তাদের কাছে দারিদ্র্য প্রধান সমস্যা নয়। মানুষ মর্যাদাহীনভাবে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। সে চায় আত্মমর্যাদা, যা হিন্দু ধর্ম অস্বীকার করেছে। অন্ত্যজরা যে মুহূর্তে হিন্দু ধর্মের বাঁধন ছিঁড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে সেই মুহূর্তেই তারা আত্মমর্যাদা লাভ করবে।

অন্ত্যজরা আবিষ্কার করেছে যে, ধর্মান্তরণের ফলে তাদের লাভ হয়েছে, কারণ এখন থেকে আর তাদের নিপীড়ন করা সম্ভব নয়। ধর্মান্তর অন্ত্যজ এবং শূদ্রদের জাত প্রথাকে ধ্বংস করতে সাহায্য করেছে এবং পরবর্তী স্তরে-শ্রেণী সংগ্রাম-পৌছানোর জন্য তাদের পথ সুগম করেছে।

দীর্ঘ কুড়ি বছর ভাবনাচিন্তার পর আম্বেদকার বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা হওয়ায় অস্পৃশ্যতার মূলোৎপাটনে এর ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ আম্বেদকারসহ অন্যান্য যারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তারা আজও অন্ত্যজরূপে পরিগণিত হন। সেইজন্য অন্ত্যজদের অধিকাংশই খ্রিস্টান ধর্ম পছন্দ করে, সাম্প্রতিককালে একমাত্র তামিলনাড় তেই ইসলাম ধর্মের প্রতি একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

হিন্দু ধর্মের অস্পৃশ্যতা এমনই সংক্রামক যে, এটা অন্য কোন ধর্মকে রেহাই দেয়নি। যারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা ধর্মান্তরণের সময় তাদের জাতকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চার্চ কর্তৃপক্ষ ধর্মান্তরিতদের জাতগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে অনুমতি দিয়েছে। এমনকি বর্তমানে চার্চগুলোতে ধর্মান্তরিত অন্ত্যজদের জন্য পৃথক সমাধি স্থান দেখা যায়।

কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার থাকা দরকার, খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্ম জাতবিভাজনকে অনুমোদন করে না। জাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করে খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্ম তাদের ধর্মীয় সমর্থন জানায়। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায় না। এই কারণে ভারতে চার্চগুলোতে জাতগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম দেখা যায়। জাত বিভাজন সত্ত্বেও যে সমস্ত অন্ত্যজ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা হিন্দু ধর্মে আসীন অন্যান্য অস্পৃশ্যদের তুলনায় আবেগগত এবং মানসিক দিক থেকে অনেক উন্নত অবস্থায় আছে।

ভারতের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত তামিলনাড় তে ইসলাম ধর্মের প্রতি সম্প্রতি যে নতুন ঝোঁক দেখা দিয়েছে তা হিন্দু পুরোহিতদের মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে। এই অঞ্চলে ব্যাপক ইসলাম ধর্মে রূপান্তর কোনো নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু গোঁড়া হিন্দু এবং মৌলবাদী দল আরএসএস এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, কারণ হিন্দুদের মতে– ইসলাম ধর্ম ব্রাহ্মণ ধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু। ইসলাম ধর্মে সাম্যবাদী ভাবাদর্শ অন্ত্যজদের আকর্ষণ করেছে। এমনকি খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে এমন অনেকেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। স্পষ্টতই হিন্দু ধর্ম শুধু অ-গণতান্ত্রিকই নয়, অমানবিকও বটে। এমনকি ব্রাহ্মণরাও যারা হিন্দু ধর্মের অভিভাবক-এই শ্বাসরোধকারী ধর্ম থেকে বাস্তবে লাভবান হয়নি। শতশত ব্রাহ্মণ পবিত্র ভারত ছেড়ে পালিয়ে গেছে এবং অপবিত্র গো-মাংস খাদক আমেরিকা ব্রিটেন এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে। স্বদেশে অবস্থানের সময় বিভিন্ন অনুযোগের কথা তারা আজও বলে থাকে।

গান্ধীর 'অহিংসা' নীতির ব্যাপক প্রচার বিদেশীদের বিভ্রান্ত করতে পারে। কিন্তু অন্ত্যজদের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা এই ভ্রান্ত ধারণাকে উড়িয়ে দিতে চাই। পৃথিবীর কোন প্রান্তেই হিন্দুদের চেয়ে বেশি সহিংস এবং রক্তপিপাসু মানুষ দেখা যায় না। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর দিল্লীতে যা ঘটেছিল তা এই বক্তব্যের বড় প্রমাণ। নিঃসন্দেহে হিন্দু ধর্ম আজ মুমূর্ষু। নিজ ভারে এ আজ ন্যুব্জ। ভারতে হিন্দু ধর্মের তুলনায় খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। নগরায়ন এবং বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ব্রাহ্মণ ধর্মের দুর্গে অগ্নিসংযোগ করেছে। কিন্তু যে প্রধান দুটো খুঁটির জোরে হিন্দু ধর্ম টিকে আছে তারা হল জাত ব্যবস্থা এবং কর্মের তত্ত্ব বা পুনর্জন্ম এবং প্রারম্ভে বিশ্বাস।

হিন্দুরা গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন আজ সংখ্যালঘুর ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরশাসনে পর্যবসিত এবং জাতযুদ্ধে নিমজ্জিত করতে পারে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে গণ্য। ভারতের অন্ত্যজ এবং আদিবাসী সম্প্রদায় এত দুর্বল কি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এমনকি দৈহিক দিক থেকেও যে বিপ্লবের, যা মরীচিকা

ছাড়া আর কিছুই নয়, এর জন্য অপেক্ষা করার মত ধৈর্য তাদের নেই। সেই জন্য বিপ্লবের জন্য অনন্ত প্রতীক্ষার পরিবর্তে তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট হয়েছে। *মূল ইংরেজী থেকে ভাষান্তর।*

প্রখ্যাত সাংবাদিক শাহ্ আহমদ রেজার ঐতিহাসিক নিবন্ধ
ভারতে মুসলমানদের পাশে কেউ দাঁড়ায়নি, দাঁড়াবেও না

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটে সংখ্যালঘু অসহায় মুসলমানদের হত্যার নৃশংস অভিযান এগিয়ে চলেছে এবং আব্দুস সামাদ আজাদসহ এদেশের ভারতপন্থীরা যত চাতুরিপূর্ণ বক্তব্য আর কৌশলের আশ্রয়ই নেন না কেন, এই সত্য ইতোমধ্যে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, গুজরাটে চলমান অভিযান আসলে সুচিন্তিতভাবে পূর্বপরিকল্পিত, মুসলমানদের নির্মূল করা যা একমাত্র উদ্দেশ্য। আঁতকে ওঠার মতো অন্য একটি প্রাসঙ্গিক ও প্রধান তথ্য হলো, হত্যা ও নির্মূল করার এই অভিযানের সঙ্গে গুজরাটের রাজ্য সরকার তো বটেই, বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন হিন্দুবাদী কেন্দ্রীয় সরকারও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। এজন্য অন্তত ১৯৯৯ সাল থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে, উগ্রপন্থী হিন্দু ঘাতকদের পাশাপাশি পুলিশকেও কয়েক মাস আগে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এরপর এসেছে লোক দেখানো নাটক মঞ্চায়নের তথা গোধরা রেলস্টেশনে 'সাবরমতি' নামের ট্রেনে অগ্নিসংযোগের পালা। এসবই করা হয়েছে প্রণীত পরিকল্পনা অনুসারে, যার প্রমাণ পাওয়া গেছে রাতারাতি গুজরাটের সর্বত্র হত্যা ও ধ্বংসের অভিযান শুরু হওয়ায় এবং সর্বাত্মক হয়ে ওঠায়। বিজেপি পরিবারের বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের চিহ্নিত উগ্রপন্থী ঘাতক থেকে কংগ্রেসের সমর্থক হিন্দুবাদিরা পর্যন্ত এই নিষ্ঠুর অভিযানে অংশ নিয়েছে, এমনকি 'মহাত্মা' নামে নন্দিত রাজনীতিক করম চাঁদ গান্ধীর অতি আদরের সেই দলিত বা অচ্ছুৎজনেরাও মেতে উঠেছে বর্ণ হিন্দুরা সবসময় যাদের নিষ্পেষিত অবস্থায় রাখে।

সবচেয়ে ভয়ংকর ভূমিকা পালন করেছে পুলিশ বাহিনী। মুসলমানদের জানমাল রক্ষার সামান্য চেষ্টা করার পরিবর্তে পুলিশ ঘাতকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে এবং ঠিকানাসহ মুসলমানদের তালিকা তো দিয়েছেই, উপরন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত মুসলমানদেরকে ঘাতকদের হাতে তুলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, পুলিশের লোকজন নিজেরাও প্রায় সকল ক্ষেত্রে হত্যার অভিযানে অংশ নিয়েছে।

সরকারের জড়িত থাকা ও পুলিশের ভূমিকা সংক্রান্ত এসব তথ্য জানা গেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিদেশী নাগরিকের রিপোর্ট এবং খোদ ভারতীয়দের বিবরণী থেকে। এ ব্যাপারে প্রথমে জানিয়েছেন ভারতে কর্মরত বৃটিশ

কর্মকর্তারা। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে প্রণীত রিপোর্টে তারা হত্যার অভিযানের জন্য গুজরাটের রাজ্য সরকারকে সরাসরি দায়ী করে বলেছেন, মুসলমানদের বিতাড়ন ও নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়েই এ অভিযান চালানো হচ্ছে। বৃটিশ কর্মকর্তাদের পরপর এসেছে প্যারিসভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ফেডারেশনের রিপোর্ট। এতে বিশেষ করে, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে এবং অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করে জানানো হয়েছে যে, পুলিশ নিজেও হত্যার অভিযানে জড়িত রয়েছে। পুলিশের লোকজনও এ ব্যাপারে অভিযোগ অস্বীকার করেনি। তারা বলেছে, ঘাতকদের বাধা না দেয়ার এবং গ্রেফতার না করার জন্য তাদের ওপর 'প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপ' ছিল। ঐ ফেডারেশনের মতে যে চাপ কেবল সরকারের পক্ষ থেকেই আসা সম্ভব।

এদিকে ভারতের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক সৌমিত্র ঘোষ জানিয়েছেন– অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও ভয়াবহ তথ্য। গত ৮ মে তেহরান রেডিওকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি সরাসরি বলেছেন, পুলিশ হত্যাকারীদের পক্ষে ছিল ও রয়েছে এবং গুজরাটের ঘটনা মোটেও দাঙ্গা নয়; বরং একতরফাভাবে একটি সম্প্রদায় তথা মুসলমানদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র, এটা গণহত্যা। পুলিশের মুসলমানবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে সৌমিত্র ঘোষ বলেছেন, এসব কথাই সত্যি, আমি আমার ছবিতেও প্রচুর সাক্ষাৎকার রেখেছি... প্রত্যেকেই ব্যাপারটা বলেছে যে, পুলিশ পুরোপুরিই হিন্দু ঘাতকদের সাহায্য করেছে, পুলিশ পুরোপুরি ওদের সাথে ছিল...।

সৌমিত্র ঘোষ সেই সাথে বর্তমান সময়ের গুজরাটে 'খুব জনপ্রিয়' একটি শ্লোগানের উল্লেখ করেছেন- ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত এক বিজ্ঞাপনের অনুকরণে এই শ্লোগানে বলা হচ্ছে, 'ইয়ে আন্দার কি বাত হ্যায়, পুলিশ হামারা সাথ হ্যায়'। অর্থাৎ এটা গোপনীয় কথা যে, পুলিশ ঘাতকদের সঙ্গে রয়েছে এবং সেকথা ঘাতকরাই জানিয়ে দিচ্ছে। ভারতের এই চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক ১৯৯৯ সালের এমন একটি গোপন পুলিশ রিপোর্টও পেয়েছেন, যেখানে মুসলমানদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার এবং সরকারকে জানানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের কে কোথায় বসবাস করেন, তাদের ছেলেমেয়েরা কোন স্কুল বা কলেজে লেখাপড়া করে, কোন কলেজ থেকে পাস করেছে, কোথায় কি চাকরি বা ব্যবসা করে- এরকম যাবতীয় তথ্য পুলিশকে সংগ্রহ করতে ও জানতে বলা হয়েছে এবং পুলিশ সে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছে সম্পূর্ণরূপে।

একই ধরনের তথ্যের উল্লেখ রয়েছে অন্য সকল রিপোর্ট ও বিবরণীতেও। কিন্তু সেসব প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে উল্লেখ করা দরকার যে, সৌমিত্র ঘোষ

৩—

গুজরাটে মুসলিম নিধনের ওপর একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম বা প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করেছেন। নাম দিয়েছেন 'নাথিং অফিসিয়াল'। রেডিও তেহরানকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি দু'টি প্রতীকী দৃশ্য রাখার তথ্য জানিয়ে বলেছেন, একটি দৃশ্য দেখা যাবে কিভাবে সপ্তদশ শতকের মুসলমান কবি ওয়ালী গুজরাটির তিনশ' বছরের পুরনো মাজার 'মাটির সাথে পুরো মিশিয়ে দেয়া হয়েছে'। দ্বিতীয় দৃশ্যটি একটি মসজিদ ধ্বংস করার। সৌমিত্র ঘোষ বলেছেন, 'ধর্মীয় মাদ্রাসা বলুন, মক্তব বলুন, মসজিদ বলুন- এরকম ২৫০টি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে'। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'গুজরাটে নারী নির্যাতন বীভৎসভাবে হয়েছে। এই ভিকটিমদের সংখ্যা প্রচুর। আমি আমার ছবিতেও রেখেছি। এ ধরনের শট-যেমন, মেয়েরা হাতে-পায়ে ধরছে, পুলিশকেও বলছে যে, আমাদেরকে বাঁচান আমাদের তো ধর্ষণ করবে। ওরা (অর্থাৎ পুলিশ) বলছে যে, তোমাদেরকে তো মরতেই হবে'। কথা শেষ করতে গিয়ে এরপর সৌমিত্র ঘোষ বলেছেন, এরকম কতটা বলবো? এখন সারা পৃথিবীকেই বলা উচিত যে, এটা একটা গণহত্যা'।

এবার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর রিপোর্ট থেকে কিছু তথ্যের উল্লেখ করা যাক। নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর গত ১৯ এপ্রিল প্রকাশিত রিপোর্টেও রয়েছে একই ধরনের অসংখ্য ঘটনার বর্ণনা। যেমন সরকারের ভূমিকা সম্পর্কিত অংশে বলা হয়েছে, প্রতিটি আক্রমণের পেছনে রাজ্য সরকারের পুলিশ ও অন্যান্য কর্মকর্তা জড়িত ছিল। শুধু তাই নয়, একজন পুলিশ কর্মকর্তার মন্তব্য উদ্ধৃত করে রিপোর্টের শিরোনাম রাখা হয়েছে 'উই হ্যাভ নো অর্ডারস টু সেভ ইউ'- তোমাদের রক্ষা করার জন্য কোনো নির্দেশ আমাদের দেয়া হয়নি। অনেক তথ্য-প্রমাণসহ রিপোর্টে জানানো হয়েছে, মুসলমানদের ওপর হামলার সময় তাদের রক্ষা করা দূরে থাক, পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই ঘাতকদের নেতৃত্ব দিয়েছে এবং সাহায্য করার আশ্বাস দিয়ে পুলিশ উল্টো মুসলমানদেরকে ঘাতকদের হাতে তুলে দিয়েছে। বিপন্ন মুসলমানদের টেলিফোন পাওয়ার পর পুলিশ কর্মকর্তারা এক কথায় জানিয়েছেন, 'উই হ্যাভ নো অর্ডারস টু সেভ ইউ'।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর ৭৫ পৃষ্ঠায় রিপোর্টেও হত্যার অভিযানের জন্য প্রত্যক্ষভাবে বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে বলা হয়েছে, হত্যার এই অভিযান পূর্বপরিকল্পিত। এটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত আক্রমণ এবং প্রতিটি আক্রমণই আগে থেকে ছক কেটে কেটে চালানো হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, কয়েক মাস আগে থেকে এজন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং গুজরাটের রাজ্য সরকার, প্রশাসন ও পুলিশের সর্বাত্মক অংশগ্রহণে মুসলমান হত্যার এই অভিযান

চালানো হয়েছে। প্রথমে কুপিয়ে জখম করার পর আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলার অসংখ্য ঘটনার বর্ণনার পাশাপাশি রিপোর্টে বিভিন্ন স্থানে গণকবরের সন্ধান পাওয়ার তথ্য জানানো হয়েছে। এমন মুসলমান পরিবারের কথাও রিপোর্টে রয়েছে, যে পরিবারের ১৯ জন সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে এবং বেঁচে আছে মাত্র একজন।

মুসলমানদের হত্যার এই অভিযানের বিস্তারিত বর্ণনা পুনরুল্লেখের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। ভারতে কর্মরত বিদেশী নাগরিক ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসমূহের রিপোর্ট থেকে খোদ ভারতীয়দের বিবরণী পর্যন্ত সর্বত্রই রয়েছে আতংকিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার মতো অসংখ্য তথ্য প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রধান একটি তথ্য হলো, গুজরাটে যা চলছে, তা কোনোক্রমেই বিচ্ছিন্ন দাঙ্গা নয়; বরং পূর্বপরিকল্পিত মুসলিম নিধন অভিযান। প্রতিটি রিপোর্ট ও বিবরণীতে সুনির্দিষ্টভাবে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মুসলমানদের বিতাড়ন ও নির্মুল করাই এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। এখানে দু'জন ভারতীয় লেখকের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। সৌমিত্র ঘোষ এই অভিযানকে সরাসরি 'গণহত্যা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঔপন্যাসিক অরুন্ধতি রায় একে বলেছেন, 'বিশুদ্ধ ভারতীয় ফ্যাসিবাদ'। বস্তুত একটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার লক্ষ্যাভিসারী অভিযানের সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে গুজরাটে চলমান এই গণহত্যার মধ্যে। আর সে কারণেই এসেছে সরকারের নীতি-কৌশল ও ভূমিকা বা অবস্থানের প্রসঙ্গ। এটা প্রাসঙ্গিক দ্বিতীয় প্রধান তথ্য এবং পর্যালোচনায় দেখা যাবে, প্রাথমিক দিনগুলোতে 'সাধু' সাজবার চেষ্টা করলেও রাজ্যের ও কেন্দ্রের উভয় সরকারই ধরা পড়ে গেছে। বড় কথা, একযোগে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার তো বটেই, অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারও হত্যার এই অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। যে কোনো দেশের গণতান্ত্রিক নামধারী সরকারের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ নিঃসন্দেহে গুরুতর এবং সে অভিযোগ প্রমাণিত হলে শংকিত না হয়ে পারা যায় না। রাজ্য সরকারের প্রশ্রয় ও অংশগ্রহণের ব্যাপারে প্রথম থেকে প্রমাণ পাওয়া গেলেও কেন্দ্রীয় সরকারের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে পর্যায়ক্রমে এবং এক্ষেত্রেও সরকার নিজেই ধীরে ধীরে ধরা দিয়েছে। মুসলমানদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাসহ সকল প্রকারে প্রস্তুতি নেয়ার পাশাপাশি ঘাতকদের জড়িত করার মাধ্যমে গুজরাটের মোদী সরকার যেখানে প্রকাশ্যে আসতে দ্বিধা করেনি, কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত না জানার ভান করেছে এবং তারপর নিয়েছে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কৌশল। নরেন্দ্র মোদীকে বরখাস্ত করার দাবি মেনে নেয়া দূরে থাক, প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী এমনকি

দীর্ঘদিন পর্যন্ত লোকসভায়ও মুসলিম নিধনের বিষয় নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠানে অস্বীকৃতি জানিয়ে এসেছেন। দু'মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর এমন এক সময়ে তিনি লোকসভায় বিতর্কের ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন, যখন মুসলমানদের হত্যা ও উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে প্রণীত পরিকল্পনার বিরাট অংশের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে- যখন আর গুজরাটের মুসলমানদের পক্ষে অন্তত মাথা তুলে দাঁড়ানো, প্রতিবাদ জানানো এবং বিরোধী দলের দাবির সমর্থনে সাক্ষী হিসেবে এগিয়ে আসা সম্ভব ছিলো না। আর ঠিক ঐ পর্যায়ে এসেই প্রধানমন্ত্রীসহ ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এবং প্রায় প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারাও এর পেছনে রয়েছেন।

এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে, যদি প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজের দু'টি সর্বশেষ মন্তব্যের উল্লেখ করা যায়। লোকসভায় বিতর্ক শুরু হওয়ার প্রাক্কালে গোয়ায় অনুষ্ঠিত বিজেপি'র সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী তার ভাষণে গুজরাটে চলমান হত্যার অভিযানের জন্য উল্টো মুসলমানদের দায়ী করে বসেছেন। মূল কথায় তিনি বলেছেন, যেখানেই মুসলমান, সেখানেই সন্ত্রাস। তাদের ধর্ম সন্ত্রাস শেখায় এবং পৃথিবীর কোথাও তারা শান্তিতে থাকতে চায় না'। ভাষণের পরবর্তী অংশে বাজপেয়ী মুসলমানদের দায়ী করে বলেছেন, গুজরাটের পরিস্থিতির জন্য তার নিজের কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের এবং মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। ওদিকে আরো ভয়ংকর কথা বেরিয়ে এসেছে জর্জ ফার্নান্দেজের মুখ থেকে। এককালের সমাজতন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফার্নান্দেজ লোকসভায় অনুষ্ঠিত বিতর্কে অংশ নিতে গিয়ে বলেছেন, রেপ বা ধর্ষণ এমন কোনো বিষয় নয়, এটা অতীতেও বহুবার ঘটেছে। এ পর্যন্ত এসেও থেমে যাননি ফার্নান্দেজ, এরপর তিনি বলেছে, 'গর্ভবতী মায়ের পেট কেটে শিশু হত্যা করা হয়েছে বলে যা বলা হচ্ছে, তা কি এক গুজরাটেই ঘটেছে? এর আগে কি এমন ঘটনা আর ঘটেনি? ১৯৪৭ সাল থেকে এমন ঘটনা কতবার ঘটেছে, তার হিসাব করে দেখুন। বক্তব্যের শেষভাগে এসে জর্জ ফার্নান্দেজ একটু ঘুরিয়ে বলেছেন, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ভারতে নতুন নয় এবং সে কারণে রাজ্যের বা কেন্দ্রের সরকারকে দায়ী করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

আমরা মনে করি না যে, প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফার্নান্দেজের মূল কথার উদ্ধৃতি দেয়ার পর ক্ষমতাসীন অন্য কোন মন্ত্রী বা নেতার বক্তব্য উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন পড়তে পারে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কথার দায়দায়িত্ব এড়াতে চাইলেও দু'জনই প্রকারান্তরে নিজেদের সমর্থন ও অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন এবং চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ভবিষ্যতে আরো ভয়াবহ হত্যার

ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। ঘাতকদের প্রতি উস্কানিও দিয়েছেন তারা প্রত্যক্ষভাবেই। প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসের জন্য এমনভাবে মুসলমানদের দায়ী করেছেন, যার অর্থ হলো, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে হত্যার অভিযান চালানো যেতে পারে এবং এতে দোষের কিছু নেই, বরং সেটাই তাদের প্রাপ্য! প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফার্নান্দেজও একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই কথা বলেছেন এবং ঘাতকদের প্রতি সমর্থন ও উৎসাহ জুগিয়েছেন।

মুসলমান তথা দেশের নাগরিকদের জান-মাল হেফাজতের দায়িত্ব যে সরকারের সে সরকার নিজে যদি হত্যার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ও তার বাস্তবায়নে অংশ নেয়, তাহলে পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হতে বাধ্য এবং গুজরাটের অসহায় মুসলমানরা তেমন পরিণতির শিকার হয়েছেন। মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের অন্য কারণটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং সকল বিচারে নৈরাশ্যজনক। এখানে বিরোধী দলগুলোর কথা বলা হচ্ছে, যাদের বিরুদ্ধেও মুসলমানদের বাঁচানোর ব্যাপারে যথোচিতভাবে উদ্যোগী না হওয়ার, স্বার্থসর্বস্ব অবস্থান নেয়ার, লোক দেখানো ভূমিকা পালন করার এবং দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার অনস্বীকার্য অভিযোগ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে এসেছে সোনিয়া গান্ধী ও ন্যাশনাল কংগ্রেসের কথা। দেখা গেছে, কর্তব্য যখন ছিল আহমেদাবাদে গিয়ে মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানো এবং সমগ্র গুজরাটে হত্যার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা, কংগ্রেস তখন নয়াদিল্লীকেন্দ্রিক তৎপরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে এবং ব্যস্ত হয়েছে কেবলই লোকসভায় অধিবেশন আহ্বানের দাবিতে। বলা হচ্ছে, সরকার যেমন লোকসভার অধিবেশন নিয়ে গড়িমসি করার মাধ্যমে ঘাতকদের জন্য সময় সুযোগ করে দিয়েছে, কংগ্রেসের ভূমিকাও তেমনি সর্বতোভাবে ঘাতকদের পক্ষেই গেছে। লোকসভায় প্রদত্ত সোনিয়া গান্ধীর ভাষণেও প্রধানত এসেছে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বরখাস্ত করার দাবি যেন এই একজন মাত্র ব্যক্তিকে সরানো গেলেই মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে, যেন হত্যার অভিযানে রাজপেয়ীসহ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা বা অংশগ্রহণ নেই। অন্য একটি প্রাসঙ্গিক তথ্যও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। বিরোধী দলগুলোর প্রতিবাদ ও সমালোচনার মুখে প্রধানমন্ত্রী গুজরাটের রাজ্য বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়েছেন, কিন্তু সোনিয়া গান্ধী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর কারণ, ভারত এতটাই 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র যে, গুজরাটে এখন নির্বাচন হলে মুসলিম নিধনে নেতৃত্ব দেয়ার পুরস্কার হিসেবে বিজেপির নেতৃত্বাধীন জোটই বিজয়ী হবে এবং একই নরেন্দ্র মোদী ফিরে আসবেন মুখ্যমন্ত্রীর পদে। সোনিয়া গান্ধী তাই নির্বাচন এড়াতে চান- যার অর্থ, হিন্দুবাদীরা ক্ষমতায় থাকলে কংগ্রেসের আপত্তি নেই। আর হিন্দুবাদীরা ক্ষমতায় থাকলে মুসলমানদের

পরিণতি সম্পর্কে যেহেতু ইতোমধ্যে সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে, সেহেতু একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, কংগ্রেসেরও সম্ভবত এ ব্যাপারে তেমন আপত্তি বা অনাগ্রহ নেই। বলা হচ্ছে, বিরোধিতা ও প্রতিবাদের নামে কংগ্রেস যেটুকু করেছে, সেটুকু করেছে নিজের 'ধর্মনিরপেক্ষ' পরিচিতিকে টিকিয়ে রাখার এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যে 'ভোট ব্যাংক' হিসেবে পরিচিত মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার প্রধান উদ্দেশ্য ও কৌশল থেকে। এর মধ্যে মুসলমানদের জান-মাল হেফাজতের সামান্য ইচ্ছাও নেই। শুনতে কঠোর মনে হতে পারে, কিন্তু এই অভিমতের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের আমলেও ভারতীয় মুসলমানরা বিভিন্ন রাজ্যে বহুবার হত্যা ও নির্যাতনের অসহায় শিকার হয়েছেন- প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্দেজের বক্তব্যে যে ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, বিজেপি জোট যেখানে উগ্রপন্থী হিন্দু হিসেবে প্রকাশ্যে দৃশ্যপটে এসেছে কংগ্রেস সেখানে সবসময় 'ধর্মনিরপেক্ষতার' খোলস চাপিয়ে রেখেছে। এই মুহূর্তেও কংগ্রেস একই খোলসকে আঁকড়ে ধরে আছে- যার ফলে মুসলমানদের হত্যার অভিযান চালানো সম্ভব হয়েছে এবং এখনও সে অভিযান বন্ধ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

তথ্য হিসেবে অত্যন্ত আশংকাজনক হলেও এভাবে পর্যালোচনায় দেখা যাবে, গুজরাটের মুসলমানরা প্রকৃত অর্থেই অসহায় হয়ে পড়েছেন এবং তাদের পাশে আসলে কেউই দাঁড়ায়নি। যদিও অভিনয় করার মতো নেতা-নেত্রী ও রাজনীতিক দলের কোনো অভাব নেই সেখানে। বাস্তবে ভারতের অন্য সকল অঞ্চলের মুসলমানদের অবস্থাও সাধারণভাবে একই রকম, দম্ভের সঙ্গে জর্জ ফার্নান্দেজ যে ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, গুজরাটে চলমান হত্যার অভিযানের মধ্য দিয়ে একথাও পরিষ্কার হয়ে গেয়ে যে, মুসলমানদের পাশে সহজে বা অদূর ভবিষ্যতে কেউ দাঁড়াবেও না। সুতরাং মুসলমানদেরকেই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং আমরা জানি ও গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, মুসলমানরা এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছাড়া কারো কাছে মাথানত করবে কিংবা মাসের পর মাস ধরে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অসহায় শিকার হবে, এমনও নয়। আমরা অবশ্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কিত মন্তব্য এড়িয়ে যেতে চাই। তা সত্ত্বেও একটি কথা জানিয়ে রাখা দরকার- প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ইতোমধ্যে 'কিলার' বা 'ঘাতক' বিহারী বাজপেয়ী হিসেবে কুখ্যাত হয়ে উঠেছেন। প্রশ্ন হলো, তিনি কি শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযানে নেতৃত্ব দেয়ার কারণেই কুখ্যাত হয়ে থাকবেন নাকি ভারতের ভাঙন ঘটানোর জন্যও একসময় ইতিহাস তাকে দায়ী করবে?

দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ মে ২০০২।

গুজরাটে মুসলিম নিধন ঃ অন্ধ বধির বিশ্ববিবেক

তাবৎ বিশ্বের তথাকথিত মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী 'হিন্দু-খৃস্টান-ইহুদী' গোষ্ঠীর ত্রিমুখী ষড়যন্ত্র ও যৌথ সাঁড়াশি আক্রমণের কালো থাবায় মুসলিম বিশ্ব আজ চরম হুমকির সম্মুখীন। নিশ্চিহ্ন হচ্ছে মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ, জান-মাল-ইজ্জত হারাচ্ছে লক্ষ লক্ষ আদম সন্তান। গণতন্ত্রের মুখোশধারীরা সন্ত্রাস দমন, অপশক্তি রোধ ও সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে মুসলমানদের ধর্ম-স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের হিংস্র নখর বিস্তার করে। যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের আবাসভূমি দখল, স্বাধীন জীবনযাপন ও ধর্মপালনে অন্তরায় সৃষ্টির মাধ্যমে অতিষ্ঠ করে তুলেছে মুসলমান জনজীবনকে। ষড়যন্ত্র, অমানবিকতা, জুলুম-নির্যাতন ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তোলায় ইসলামের শত্রুরা আজ খড়্গহস্ত। তারই দাবদাহে জ্বলছে ফিলিস্তিন, জ্বলছে গুজরাট। আরও জ্বলছে অনুল্লিখিত বিশ্বের বহু মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা।

খ্রিস্টান-ইহুদী চক্রের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মুক্তিকামী ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতা যখন ভূলুণ্ঠিত, আরব বিশ্ব তথা মুসলিম বিশ্বকে বোকা বানিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের নামে এক লাদেনকে ধরার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন গোটা আফগানিস্তানকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করছে, কাশ্মীরে যখন নারী-পুরুষ-শিশুদের নির্বিচারে হত্যা ও ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, ঠিক সেই মুহূর্তে ১৯৯২-এর উগ্রপন্থী হিন্দুরা বাবরী মসজিদ ধ্বংস ও মুসলিম নিধনের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে গুজরাটে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে উস্কানি দিয়ে প্রধান নগরী আহমেদাবাদসহ গুজরাটের সর্বত্র নির্বিচারে মুসলমান নারী-পুরুষ-শিশুদের হত্যা, জীবন্ত দগ্ধ ও অতর্কিতে তাদের আবাসভূমি জ্বালিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে উন্মত্ত হয়েছে বাজপেয়ী সরকার।

গুজরাটে মুসলমান গণহত্যার নৃশংসতা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। গত দু'মাসের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় গুজরাটে এ পর্যন্ত সরকারী হিসাবে অন্তত ৯শ মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে। তবে পশ্চিমা কূটনীতিক ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার গ্রুপগুলোর পরিসংখ্যান হিসাবে মৃতের সংখ্যা হবে ২ থেকে ৩ হাজার। গুজরাটের মুসলিম নিধনকে পত্রিকাগুলো 'হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা' হিসেবে অভিহিত করলেও আসলে একচেটিয়া মুসলিম গণহত্যাই চলছে সেখানে। ট্রেনে অগ্নিসংযোগ, সুরেন্দ্রনগরে মুসলমান ড্রাইভারের গাড়ির নিচে চাপা পড়ে পুরোহিত নিহত, মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর হামলা করেছে-এসব নানা প্রমাণহীন গুজব ছড়িয়ে উগ্র হিন্দুরা নিরীহ মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। উত্তেজিত হিন্দুরা সুরেন্দ্রনগরে মুসলমানদের ২০টি দোকান ও বাড়িতে

আগুন ধরিয়ে দেয়। এছাড়া ভারচু জেলায় অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন সহিংসতা ঘটে। সর্বশেষ পুলিশ গুজরাটের মনিনগর এলাকায় তিনজনকে গুলি করে হত্যা করে। শহরের চাড় লা তালাব এলাকায় উন্মুক্ত দাঙ্গাকারীরা তিনজনকে জীবন্ত দগ্ধ করে মেরে ফেলে। বরোদা জেলায় এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতে এবং আরেক ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। ইতোমধ্যে এসব ঘটনায় গুজরাটে নতুন করে নয়জন মুসলমানকে হত্যা করা হয়। নিত্য চলছে নিরপরাধ মুসলমানদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন, সম্পদ লুণ্ঠন ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ।

গুজরাটে মুসলমান গণহত্যা ও হিন্দু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে আড়াল ও ধামাচাপা দেয়ার জন্য নিজেদের দায়মুক্ত করার শেষ রফা হিসেবে ভারতীয়রা তথাকথিত 'শান্তি মিছিল'-এর আয়োজন করে। তাও গুজরাটে নতুন করে সহিংসতা বৃদ্ধির কারণে এহেন আয়োজন। তাছাড়া মুসলমানদেরকে মিছিলে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেদের আত্মস্বার্থ হাসিল ও আন্তর্জাতিক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই এ মিছিলের আসল উদ্দেশ্য। গত ২৮ এপ্রিল ভারতের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ ও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অরুণ জেটলির নেতৃত্বে আহমেদাবাদে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এই মিছিল বের করে। শান্তি মিছিলে লোকের সমাগম ছিল নেহায়েত কম। বড় জোর এক হাজার। মুসলমান মোটামুটি এই পদক্ষেপকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মুসলমানদের সর্বস্বান্ত করে শেষ পর্যন্ত 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই, হিন্দু-মুসলমান এক হও' এসব স্লোগানকে তারা 'প্রহসনমূলক প্রেসক্রিপশন' মনে করছে। গুজরাটে মুসলমান গণহত্যার ইন্ধনকারী, দাঙ্গা পরিস্থিতিতে বিতর্কিত ভূমিকা পালনকারী অভিযুক্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কার্যত শান্তি মিছিলে অংশগ্রহণ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে স্তম্ভিত করেছে। অভিযোগ রয়েছে, মোদি দাঙ্গাকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৯৯৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর গুজরাটে দাঙ্গা দমনে ব্যর্থ-বিজেপি সরকার নতুন করে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল। সবচেয়ে বড় কথা, গুজরাট বিজেপি সরকার পরিচালনা করছে। গণতন্ত্র, বিশ্বায়ন, মিলেনিয়াম, মানবাধিকার, সমন্বয় সাধন, ঐকমত্য, সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি, সুশীল সমাজ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন, নারী-স্বাধীনতা– এসবকে আধুনিকতার বিষয় ও লক্ষণ হিসেবে যখন বিবেচনা করা হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে সন্ত্রাস দমন ও সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও গুজরাটের নিরীহ মুসলমানদের স্বাধিকার ও অধিকারচ্যুত করে নির্বিচারে হত্যা করছে উগ্রপন্থী অগ্নিপূজক ও দেব-দেবীর প্রেতাত্মারা। আর বিশ্ব মোড়ল জাতিসংঘ, নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বাহিনী, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনসহ দেশীয় ও বিদেশীয় সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তাকিয়ে দেখছে, হোলি খেলার সেই

মৃত্যু-দৃশ্য, যেন কারোরই কিছু করণীয় নেই মানবতা বিধ্বংসীদের বিরুদ্ধে। কী বীভৎস প্রহসনের ঘোরে আচ্ছন্ন বিশ্ব বিবেক।

আসলেই কবীর চৌধুরী, শাহরিয়ার কবীর, মুনতাসীর মামুন ও বাজপেয়ীরা আধুনিক বিশ্বের ইন্টারনেট যুগের হিটলার-মুসোলিনী, চেঙ্গিস-হালাকু, পলপট-ফার্ডিনান্ড-এর যোগ্য উত্তরসূরি। কারণ কবীর চৌধুরীর বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে পান অথচ সম্প্রতি ভারতীয় হিন্দুরা যখন গুজরাটে সহস্রাধিক মুসলমানকে পুড়িয়ে মেরেছে, শত শত মুসলিম শিশু, বালিকা ও নারীকে গণধর্ষণ করেছে তখন তারা বিবৃতি দেন দায়সারা গোছের। আসলে সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশেই সম্ভব বিবেককে নিলামে বিকিয়ে দিয়ে বুদ্ধিজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া।

অতীত যাদের গৌরবোজ্জ্বল, যাদের ইতিহাস বিজয়ের, সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব ও শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে যারা আপসহীন, চির-সংগ্রামী, চির-প্রতিবাদী, চির-বৈরী তারা আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে রাম-রাবণের রাজ্যে। শত্রুদের কাছে যারা মাথানত করতে শেখেনি এবং মিথ্যা, অধর্ম, কুসংস্কার, কুপ্রথা, অমানবিকতার জঞ্জাল এবং তাবৎ জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে এক সময় ছিল যাদের দৃঢ় উচ্চারণ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, যারা ঈমানী শক্তিতে ঝড়ের বেগে শত্রুপক্ষের ওপর দুর্বার আঘাত হানতে সক্ষম, সত্য ও ন্যায়-তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠা যাঁদের পূর্বসূরিদের আজীবনের সাধনা-সেই মুসা, খালিদ, তারিকের উত্তরসূরিরা আজ কেন ধরাশায়ী-বেসামাল? মুসলিম রেনেসাঁর সেই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও পুনর্জাগণের মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীদের সমুচিত জবাব দিতে হবে বিশ্বের মুসলমানদের। তথাকথিত মানবতাবাদী ও গণতন্ত্রের মুখোশধারী ধারক-বাহক আমেরিকা ও তার মদদপুষ্ট ইসরাইলীদের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে বুঝিয়ে দিতে হবে একবিংশ শতাব্দীতে ক্ষমতার পালা-বদল অনিবার্য এবং এই শতাব্দী মুসলমানদের বিজয়ের শতাব্দী।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কারণ ভারতে মুসলমানদের গণধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞের বর্বরোচিত কাহিনী ও বীভৎসের লোমহর্ষক চিত্র পত্রিকা এবং গণমাধ্যমে প্রচারিত হলেও বাংলাদেশে এর কোন প্রভাব পড়েনি; বরং এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশী মুসলমান এবং বিশ্বের মুসলমানরা অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু বাজপেয়ী এবং শ্যারনেরা সাম্প্রদায়িকতার ধূম্রজাল সৃষ্টি এবং সম্প্রসারণনীতির ফলে গুজরাট এবং ফিলিস্তিনী মুসলমানদের ওপর যে নৃশংস অমানবিক হত্যাযজ্ঞ, হামলা, বিপুল সম্পদ ও জান-মালের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি করেছে, তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে? আজকের মানবতা বিধ্বংসের এই দুর্দিনে প্রয়োজন বিশ্বের গডফাদার বা বড় সন্ত্রাসীদের চিহ্নিতকরণ

এবং আন্তর্জাতিক আদালতে এইসব অন্যায়ের বিচার ব্যবস্থা করা। এ কাজটি করবে কে? তাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বিশ্ব-মুসলিমের ঐক্যবদ্ধতা এবং সমরশক্তি অর্জন। আর এভাবেই সম্ভব হবে ভীত-বিহবল মুসলমানদের চেতনা জাগ্রত করা। মহাগ্রন্থ আল-কোরআন মুসলমানদের সাহস যুগিয়ে ঘোষণা করেছে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করবে।' *উদ্ধৃতি ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ মে ২০০২ ॥ মহিউদ্দিন মিয়া।*

জননন্দিত কলামিষ্ট হারুনুর রশীদের ঐতিহাসিক নিবন্ধ
"গোলি গোলি, উহ্ লোগ আব্বুকো মার দিয়া"

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের জন্য প্রতিদিন গুজরাট থেকে আসছে সুখবরের পর সুখবর। হিন্দুত্ববাদীরা নাঙা তলোয়ার, গ্যাস সিলিন্ডার ও পেট্রোল ভর্তি কন্টেইনার নিয়ে 'বন্দে মাতরম' ও 'জয়হিন্দ' স্লোগান দিতে দিতে প্রতিদিন হামলা চালাচ্ছে প্রতিটি মুসলিম বাড়িতে, দামি জিনিসপত্র লুট করে নিচ্ছে, তারপর গ্যাস বা পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে বাড়িঘর। কোন মুসলিম পুরুষকে ধরামাত্রই তার গায়ে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারছে এবং মুসলিম নারীদেরও হত্যা করছে প্রকাশ্যে ব্যাপক গণধর্ষণের পর। আন্তর্জাতিক সমীক্ষকদের মতে এ যাবৎ গুজরাটে তিন হাজারেরও বেশি মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষিত হয়েছেন কয়েক হাজার প্রৌঢ়া, যুবতী-কিশোরী ও শিশু। বিভিন্ন এনজিও ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন লক্ষাধিক সর্বস্বহারা মুসলমান। শতকরা ৮৫টি পরিবারেরই কেউ না কেউ প্রাণ বা ইজ্জত হারিয়েছেন জঙ্গি হিন্দুত্ববাদীদের হাতে। অনেক পরিবারে দু-একটি শিশু ব্যতীত আর কেউই বেঁচে নেই। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদেরও হত্যা করা হয়েছে, ত্রিশূলের আগায় গেঁথে। মায়ের পেট থেকে শিশু বের করে লোহার শিকে গেঁথে ঘোড়ানোর নজিরও রয়েছে। শিশু ত্রাণশিবিরসমূহে আশ্রয় নিয়েছে ৪২ হাজারেরও বেশি শিশু, যাদের ৮০ শতাংশই এতিম। এরা স্বচক্ষে দেখেছে পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজনের পুড়িয়ে মারার নির্মম চিত্র, দেখেছে মা-বোনের গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড। আহমেদাবাদের একটি এনজিও ত্রাণশিবির এই শিশুদের জন্য একটি চিত্রাঙ্কন সেশনের আয়োজন করেছিলো। সিংহভাগ শিশুই এঁকেছিলো জ্বলন্ত বাড়িঘর ও মৃত মানুষের ছবি। সবার হৃদয়েই যন্ত্রণা। যেমন তিন বছরের এক শিশু মাঝেমাঝেই চিৎকার করে বলছে, গোলি, গোলি, উহ্ লোগ আব্বুকো মার দিয়া। ছোট্ট ফাতেমার পিতামাতাকে হিন্দুরা হত্যা করে। সে ও তার ভাই একটি বাড়িতে আশ্রয়ের জন্য ছোটার সময় হিন্দুরা ভাইটিকে ধরে ফেলে এবং গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ত্রাণ শিবিরে আশ্রয়প্রাপ্ত ২৩ বছর বয়সী শবনম

পয়লা মার্চের স্মৃতিচারণ করে বলে, ত্রিশূল ও তলোয়ারধারী হিন্দু জনতা 'মিয়াকো মারো, মিয়াকো কাটো' বলে চিৎকার করতে করতে মুসলমানদের ওপর হামলে পড়ে। নারোদা পাতিয়ার হোসেননগরের সায়রা বানুও তিন সন্তান নিয়ে শিবিরে। তার বর্ণনা– আমি দেখলাম একটি উলঙ্গ মুসলিম মেয়েকে জনা পঁচিশেক হিন্দু ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছে। এক মিষ্টির দোকানের মালিক হিন্দুদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করলো। পুলিশ উচ্ছৃঙ্খল হিন্দুদের বদলে প্রাণভয়ে পলায়নপর মুসলমানদের ওপরই বেপরোয়া গুলি চালিয়ে দিলো। আমার স্বামীকেও পুলিশের গুলিতে মরতে দেখলাম।

বেস্ট বেকারির মালিক মায়মুনা শেখও এখন সর্বহারা। সে জানায়, উচ্ছৃঙ্খল হিন্দুদের পুলিশই পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। ওরা ওর ছোট ছেলেকে তুলে নিয়ে যায়। তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা পুত্রবধূ জোহরা স্বামীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে অনুময়-বিনয় করলে পুলিশ জোহরাকে ডাণ্ডাপেটা করে। জওয়ানননগরের কুলসুম, ক্ষেদব্রহ্মের নাগরী বিবি, সবরাকান্তের সামশাদ, ভাদোয়ার নাসিম ও আমেনা সবার বর্ণনাই প্রায় একইরূপ।

হিন্দু নারীরাও মুসলিম নিধন ও মুসলিম নারীধর্ষণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সহেলী নামক একটি মহিলা সংগঠনের প্রধান লক্ষ্মী মূর্তি লিখেছেন, 'সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, দাঙ্গার পক্ষে ভারতের নারীরাও রাজপথে নেমে এসেছেন। আরো বেশি মুসলমানকে হত্যা ও আরো বেশি মুসলিম নারী ধর্ষণ না করায় ক্ষুব্ধ হিন্দু নারীরা আরএসএস ও করসেবকদের অফিসে অফিসে চুড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বলছেন, তোমরা মেয়ে মানুষেরও অধম, তোমাদের পৌরুষ বলে কিছু নেই। নারীরাই পুরুষদের বলছেন, 'যাও আরো মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করো'। নৈতিকতার সব রেখা এখন মুছে গেছে। নির্বিচারে মুসলিম হত্যায় অংশ নেওয়া এখন সর্বব্যাপী। মুসলিম নিধন ও মুসলিম নারী ধর্ষণ এখন দেশপ্রেম ও পৌরুষের কাজ।'

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন সাবেক কর্মকর্তা হর্ষ মান্দার লিখেছেন, 'বহু মসজিদ ও দরগাহ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং ধ্বংসস্তূপের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে হনুমানজীর মূর্তি, উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গেরুয়া পতাকা। আহমেদাবাদনগর চৌরাস্তার নিকটবর্তী কিছুসংখ্যক দরগাহকে বুলডোজার দিয়ে এমন নিপুণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে যে, মনে হচ্ছে এখানে কোনকালেই কোন দরগাহ ছিল না। পুলিশ সরাসরি জঙ্গি হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিম নিধনে অংশ নিচ্ছে। রক্তপিপাসু হিন্দুরা প্রকাশ্যেই বলছে, 'ইয়ে আন্দরকি বাত হ্যায়, পুলিশ হামারা সাথ হ্যায়'। অর্থাৎ ভেতরের কথা হলো এই যে, পুলিশও আমাদের সঙ্গে আছে। কোন মুসলমান পুলিশের আশ্রয় চাইলে বা থানায় সাহায্য চেয়ে টেলিফোন করলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সরাসরি জানিয়ে দিচ্ছে, We have no

orders to save you' (তোমাদের রক্ষা করার কোন নির্দেশ আমাদের ওপর নেই)। এই মুসলিম হত্যাযজ্ঞে নেতৃত্ব দিচ্ছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার প্রতি খোলাখুলি সমর্থন দিচ্ছেন ক্ষমতাসীন বিজেপির শীর্ষ নেতা লালকৃষ্ণ আদভানি। গোটা বাজপেয়ী সরকারেরও রয়েছে সমর্থন। কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধীও কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিচ্ছেন না। কোন ভূমিকা নিচ্ছেন না অন্ধ্রের নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু। তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা ব্যানার্জীও প্রকারান্তরে বাজপেয়ী সরকারের ভূমিকাকেই সমর্থন দিচ্ছেন। গুজরাটের সব মুসলমান একবাক্যে বলছে, 'নরেন্দ্র মোদি নে হামারী জিন্দেগী বরবাদ কর দিয়া'।

'আউটলুক' পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী বজরং দলের সহ-সভাপতি বলেছেন, গুজরাটে যা ঘটলো ও ঘটছে তাতে অন্যায় বা অন্যায্য কিছু নেই। মুসলমানদের ঠাণ্ডা করতে পারায় আমাদের মনও অনেকটা ঠাণ্ডা হলো। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নামক একটি প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে তদন্তভিত্তিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, গুজরাটের ঘটনা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত একটি আক্রমণ। প্রতিটি আক্রমণই আগে থেকে নীলনক্সা করা। প্রতিটি আক্রমণের সঙ্গেই রাজ্য সরকারের পুলিশ ও অন্য কর্মকর্তারা জড়িত। নিউইয়র্ক টাইমসের সংবাদদাতা লিখেছেন, একটি মুসলিম বাড়িও আর অক্ষত নেই। গ্রামের মুসলমান অংশ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। আনন্দবাজার পত্রিকায় অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, হিন্দু সমাজের বৃহত্তর অংশ, যারা এই পৈশাচিক প্রকল্পে সরাসরি যোগ দেয়নি, তারাও উদাসীন থেকে বা মনে মনে খুশি হয়ে সংসারধর্ম পালন করে চলেছেন। গড অবস্মল থিংস এর বিশ্বনন্দিতা লেখিকা অরুন্ধতী রায় লিখেছেন, ভারতে এখন যা ঘটছে, তা বিশুদ্ধ ভারতীয় ফ্যাসিবাদ। কারণ, ফ্যাসিবাদের মূল কথাই হলো, 'If you don't like some people, kill them' অর্থাৎ যদি কোন জনগোষ্ঠীকে পছন্দ না করো, তাহলে তাদেরকে হত্যা করো।

এখন জঙ্গি হিন্দুরা প্রত্যেক মুসলমানের কাছ থেকে দশ টাকার স্ট্যাম্পে এই মর্মে স্বীকৃতি আদায় করছে যে, অপরাধ মুসলমানেরাই করেছে, মুসলমানদের প্রকাশ্যে মাফ চাইতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং অঙ্গীকার করতে হচ্ছে যে, তারা আর দাড়ি রাখবে না, টুপি পরবে না, হিন্দু জীবনধারা মোতাবেক চলবে এবং কোন হিন্দু ব্যবসায়ী বা দোকানদারের সঙ্গে কোনরূপ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে না।

বাংলাদেশে এমন কি কখনো হয়েছে? দলে দলে মুসলমান তলোয়ার নিয়ে প্রকাশ্যে হিন্দুদের হত্যা করতে ছুটে চলেছে, পুলিশ তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হিন্দুদের ওপর গুলীবর্ষণ করছে, বাংলাদেশে এমন দৃশ্য কি কারো পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব? লক্ষাধিক সর্বস্বহারা হিন্দু ও ৪২ হাজার পিতৃমাতৃহারা শিশুতো দূরের কথা, মাত্র পাঁচজন হিন্দু বা হিন্দু শিশু মুসলমানদের ভয়ে কোন ত্রাণশিবিরে

আশ্রয় নিয়েছে, এমন একটি মাত্র উদাহরণও কি গাফফাররা কিংবা শাহরিয়াররা কিংবা কাজী ফারুক আহমদরা দেখাতে পারবেন? অথচ তারপরও গাফফার মুকুল আবেদ মুনতাসীর শাহরিয়াররা গলা ফাটিয়ে বলেই চলেছেন যে, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যে ভয়ংকর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার নজির নাকি ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসেই আর নেই। মখা আলমগীর-বাহাউদ্দিন নাসিম প্রমুখও একথা প্রমাণ করার জন্য জীবন পণ করেছেন যে, বাংলাদেশে এখন একটা মহা উগ্র মৌলবাদী সরকার ক্ষমতায় বসে আছে এবং এই সরকারের উদ্যোগে এদেশে ভয়ংকর হিন্দুনিধন চলছে। কিন্তু, গুজরাটসহ ভারতের ঘটনাবলীর ব্যাপারে গাফফার, মুকুল, আবেদ, মুনতাসীর, মখা, শাহরিয়ার, নাসিম প্রমুখ মুখে রাঙা মুলো ভরে দিয়ে বসে আছেন। তারা ভারতের জঙ্গী হিন্দুত্ববাদী বজরং করসেবক, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বিজেপি, বাজপেয়ী, আদভানী, নরেন্দ্র মোদিসহ কারো বিরুদ্ধে কখনো একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি এবং কখনোই করবে না। কারণ, বজরংদের মতোই এরাও মনে করেন যে, মুসলমানদের পাইকারীভাবে হত্যা, মুসলিম নারীদের পাইকারী গণধর্ষণ, মসজিদ দরগাহ ইত্যাদি গুঁড়িয়ে দিয়ে তার ওপর হনুমানজীর মূর্তি স্থাপন ইত্যাদিই যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত কাজ। বাংলাদেশে কোনদিন সুযোগ ঘটলে এরা নিজেরাও এ ধরনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেও সম্ভবত খুবই বদ্ধপরিকর। কারণ, এদের মতে মুসলমানদের গণহত্যা, মুসলিম নারীদের গণধর্ষণ এবং মসজিদ-দরগাহ ধ্বংসসহ হলো মৌলবাদ নির্মূলীকরণ ও ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েমের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র উপায়। এটাই তাদের অনড় বিশ্বাসের অঙ্গ, Article of faith. আমরা অবশ্যই সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। বাংলাদেশে একজন অমুসলমানের ওপরও কোনরূপ সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন বা নির্যাতন হতে গেলে আমরা তার প্রতি তীব্রতম ঘৃণা প্রকাশ করবো, করবো নিঃশর্ত প্রতিবাদ। কিন্তু এই যে গাফফার-মুকুল-আবেদ-মুনতাসীর-মখা-শাহরিয়ার-নাসিম প্রমুখ প্রতিদিন প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন, বাংলাদেশ ও তার সরকারকে দেশে-বিদেশ হেয়প্রতিপন্ন করছেন, মুসলমানদের ওপর হামলা চালানোর জন্য ভারতীয় ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় ও সরকারের প্রতি উস্কানি দিচ্ছেন, তাঁদের ব্যাপারে কি বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের করণীয় কিছুই নেই? মুখে দ্বীন, জিহাদ ও জযবার কথা বলা আর কার্যত ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর পরিচালিত তাবৎ সশস্ত্র, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও তথ্য হামলা অম্লান বদনে হজম করার মধ্যে মোনাফেকির কোন ব্যাপার আছে কিনা সেটা অবশ্য আমাদের ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও ইসলামবিদরাই ভালো বলতে পারবেন।

দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ মে ২০০২।

জননন্দিত কলামিষ্ট মোবায়েদুর রহমানের ঐতিহাসিক নিবন্ধ

মুসলিমবিদ্বেষ এবং ভারতীয় সমরবাদের রাজযোটক লালকৃষ্ণ আদভানী এবং ডঃ আব্দুল কালাম

শুধুমাত্র ভারতবাসীই নয়, এই উপমহাদেশের সমস্ত মানুষকে চমকে দিয়ে সেদেশের শীর্ষ বৈজ্ঞানিক ডঃ আব্দুল কালামকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ঘটনাটি আরো বিস্ময়কর এ জন্য যে, গত ৮ জুন পর্যন্ত সকলেই জানতেন যে, বিজেপির পছন্দের মানুষ হলেন বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণকান্ত। পার্লামেন্টের শাসক দল হিসেবে বিজেপির চয়েস এই কান্তবাবুই প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন, এটা সকলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরই ঘটল এক অঘটন। মহারাষ্ট্রের শিবসেনারা আবদার জুড়ে দিল যে, ঐ প্রদেশের গর্ভনর পিসি আলেকজান্ডারকে প্রেসিডেন্ট বানাতে হবে। এখানে ছিল একটি ক্ষমতার রাজনীতির মারপ্যাঁচ। মহারাষ্ট্রের বর্তমান প্রাদেশিক সরকার হলো কংগ্রেস এনসিপির সরকার। এই সরকারের তক্তা উল্টে দিতে হবে। দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে যদি আলেকজান্ডার সাহেবকে বসানো যায়, তাহলে সেখানে বসে তিনি কলমের এক খোঁচা মারবেন। আর সাথে সাথে মহারাষ্ট্রে বিজেপিবিরোধী সরকারের গণেশ উল্টে পড়বে। লালকৃষ্ণ আদভানী তো শিবসেনা ও বজরং দল তথা সংঘ পরিবারকে মদদ দেয়ার জন্য একপায়ে খাড়া হয়েই আছেন। শেষ মুহূর্তে দাবার ছক সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। প্রধান জনসংঘ নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীর মাথায় ক্লিক করল এক নতুন আইডিয়া। গুজরাটে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাক্ষস রাজার ভূমিকা নিয়েছেন। সেই রাক্ষস নরেন্দ্র মোদী মানুষখোকো দানব রয়েছে। কিন্তু সেই রাক্ষস সব মানুষ খায় না। সে হিন্দু মানুষ খায় না। সে ধরে ধরে শুধু মুসলমান মানুষ খায়। সেই মুসলমানখেকো নরেন্দ্র মোদী তথা গুজরাটে চরম হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিজেপি সরকারের জন্য সারা ভারতে বিজেপির মুখে চুনকালি পড়েছে। সারা ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা সমগ্র জনগোষ্ঠির আনুমানিক ২০ শতাংশ। গুজরাটে মুসলিম নরমেধযজ্ঞের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বিজেপিকে। মাসুল দিতে হবে সারা ভারতজুড়ে। কিভাবে এই আসন্ন বিপদ ঠেকানো যায়? বিচলিত হলেন প্রবীণ নেতা বাজপেয়ী। ধ্যানস্থ হয়ে জপ করতে লাগলেন, "হরি হে, বিপদতারণ"। বিপদতারণ হয়ে অবতীর্ণ হলেন 'আধা হিন্দু', 'আধা মুসলমান' বৈজ্ঞানি এপিজে আব্দুল কালাম। প্রিয় পাঠক, কেউ ভাববেন না যে, আমি উপরের কথাগুলো কোন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বশবর্তী হয়ে বলছি। এগুলো আসলে আমাদের কথা নয়। আব্দুল কালাম সম্পর্কে এসব কথা বলেছেন ভারতের প্রগতিশীল লেখক-কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবীরা। তারাই এসব সংবাদ সারা দুনিয়ায় সাপ্লাই করে বেড়াচ্ছে। এদেরই

একজন হলেন শ্রী প্রফুল্ল বিদওয়াই। তিনি ভারতের ইংরেজি ভাষার একজন প্রখ্যাত কলামিস্ট। ভারত এবং বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকায় তার কলাম প্রকাশিত হয়। ভারত এবং বাংলাদেশের অসংখ্য দলনিরপেক্ষ মানুষ মিঃ বিদওয়ায়ের লেখার ভক্ত। সেই মিঃ বিদওয়াই তাঁর অতি সাম্প্রতিক এক লেখায় মিঃ আব্দুল কালামকে আরএসএস-এর 'পোস্টারবয় মুসলিম' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে, ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি নামাজ পড়েন না। সত্তরোর্ধ্ব এই ব্যক্তি কিন্তু নিয়মিত মন্দিরে যান। পূজা বা অর্ঘ্য দেয়ার ভঙ্গি করে নিয়মিত পাঠ করেন 'শ্রীমত ভগবত গীতা'। হিন্দি ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রবল আসক্তি, কিন্তু উর্দু ভাষাকে করেন দারুণ ঘৃণা। সুতরাং ভারতীয় বিদগ্ধজনের মতে, 'রতনে রতন চিনেছে'। তিনি বিজ্ঞানী। বড় বড় অংক আর পদার্থবিদ্যার জটিল শাস্ত্র নিয়ে তাঁর জীবন। কিন্তু এর বাইরেও আরেকটি জীবন আছে। কিন্তু কোন সে জীবন? তিনি সঙ্গীতচর্চা করেন। তিনি রুদ্রবীণার ঝংকার তোলেন। সেই ঝংকারে ক্ষুব্ধ জীবন মেতে ওঠে। আর সেই মাতনে প্রাচীন ভারতীয় সংকীর্ণ জীবন ফিরে পায়। সেই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে অবগাহন করে বিজ্ঞানী এপিজে আব্দুল কালাম। আর অবগাহন করে ভারতমাতায় লীন হয়ে যান। মুসলমান নামধারী এমন এক জটাজুটধারী শিখণ্ডিরই প্রয়োজন ছিল সংঘ পরিবারের। ইনিই সেই আব্দুল কালাম যিনি গুজরাটের হাজার হাজার মুসলমানের নরবলি এবং শত শত মুসলমানকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার বিন্দুমাত্র নিন্দাও করেননি। তারই স্বধর্মের হাজার হাজার মুসলমানের রক্তস্রোতে উষ্ণ হয়েছে আহমেদাবাদের রাজপথ। কিন্তু সহমর্মিতায় একবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলেননি এই চিরকুমার বিজ্ঞানী। ভারতের ক্ষমতার চূড়ায় এবার শোভা পাবে দুই অকৃতদার বৃদ্ধ। একদিকে চিরকুমার কবি বাজপেয়ী। আরেকদিকে অকৃতদার সঙ্গীতপিয়াসী আব্দুল কালাম। ভারতের এই দুই প্রবীণ ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং দর্শন এসে মিলিত হয়েছে এক মোহনায়। সেই মোহনা হল ভারতীয় সমরবাদ। (ইন্ডিয়ান মিলিটারিজম) একদিকে তাকে দিয়ে বিজেপির সাম্প্রদায়িক কলংকের কালিমার শুভ্রতারার চুনকাম করা হয়েছে, অন্যদিকে ঘটানো হয়েছে ভয়ংকর সমরবাদের উত্থান। অটল বিহারী বাজপেয়ী তথা সংঘ পরিবার বাজপাখির ধারালো থাবা বিস্তার করতে চাচ্ছিল। বাজপাখির থাবায় পারমাণবিক বিষ যুগিয়েছেন বৈজ্ঞানিক এপিজে আব্দুল কালাম।

॥ দুই ॥

পণ্ডিত নেহেরু এবং ইন্দিরা গান্ধিরা গান্ধীর উত্তরসূরি সোনিয়া গান্ধীর কংগ্রেস আব্দুল কালামের মনোনয়নে প্রথম সম্মতি দেননি। কিন্তু পরে বিভিন্ন

হিসাব-নিকাশ করে কংগ্রেসও তাদের গোঁফ নামিয়েছে। মুসলমানদের বারবী মসজিদ ভেঙ্গে ছিল সংঘ পরিবারের করসেবকরা। কিন্তু তাদেরকে আস্কারা দিয়েছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এবং তাদের নেতা নরসীমা রাও। সমরবাদের সূচনা ঘটে পণ্ডিত নেহেরুর সময়। পাপড়ি মেলে ইন্দিরা গান্ধী এবং তদীয় পুত্র রাজীব গান্ধীর আমলে। সমরবাদ ফলে-ফুলে এবং পত্র-পল্লবে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে বিজেপির আমলে ৯০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। এবার ভারতীয় প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন রাষ্ট্রপতি ভবনে সমরবাদে স্ট্যাম্প লাগাবে বিজেপি এনডিএ জোট সরকার। সেই স্ট্যাম্পে উৎকীর্ণ হবেন বৈজ্ঞানিক প্রেসিডেন্ট এপিজে আব্দুল কালাম।

ডঃ আব্দুল কালামের জন্ম ঘটনাচক্রে একটি মুসলিম পরিবারে। তার পিতা-মাতা মুসলমান। সেই সুবাদে জন্মসূত্রে ডঃ আব্দুল কালাম একজন মুসলমান। জন্মসূত্রে মুসলমান হলেও তিনি নামাজ পড়েন এমন কথা শোনা যায় না। তিনি কোরআন শরীফ পাঠ করেন এমন কথাও শোনা যায় না। তবে ভারতীয় পত্র-পত্রিকাতেই খবর বেরিয়েছে যে, বেদগীতা এবং উপনিষদ তার মুখস্থ। ছাপার অক্ষরেই এ কথা বেরিয়েছে যে, সব সময়ই সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেয়ার সময় বেদগীতা এবং উপনিষদ থেকে তিনি অনর্গল উদ্ধৃতি দিয়ে যান। তিনি কোনদিন রোজা রাখেননি। তিনি নিরামিষভোজী। আমিষ বলতে তার খাদ্য তালিকায় রয়েছে সপ্তাহে মাত্র একটি ডিম। কেরালার মহাকাশ কেন্দ্রের নাম বিক্রয় সরাবাই মহাকাশ কেন্দ্র। এটি কেরালার তিরুপ্রান্ত পুরমে অবস্থিত। এই হিন্দুয়ানি জীবনযাত্রার জন্য সবারই মহাকাশ কেন্দ্রের অফিসার ও কর্মচারীরা তাকে কালাম আইআর বলে ডাকেন। কেরালায় আইআর বলতে বোঝায় উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ। ভারতে যদিও ধর্মীয়ভাবে রয়েছে দু'টি প্রধান সম্প্রদায়, কিন্তু ডঃ কালাম ধর্মীয়ভাবে হিন্দু এবং মুসলমান বিভাজন মানতে রাজি নন। তার বক্তব্য হল, তার পরিচয় হল একটি অভিন্ন সত্তা। অভিন্ন সত্তা হলেও সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, সবক্ষেত্রেই হিন্দু এবং মুসলমানদের ব্যাপারে তার সমব্যথী হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যায়, মুসলমানরা নির্যাতিত হলে তার কোন দুঃখ হয় না। গুজরাটে একতরফাভাবে হিন্দুরা মুসলমান হত্যা করেছে, তিন হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে হিন্দুরা। কিন্তু মুসলমান হয়েও তিনি তিন হাজার নিহত মুসলমানের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাননি। গুজরাটের হত্যাকাণ্ডে বিপুলসংখ্যক মুসলমান উগ্রবাদী হিন্দুর হাতে নিহত হয়েছে, সেই কঠিন সত্য মনতেও ডঃ কালাম কুণ্ঠিত। গুজরাটে যা ঘটেছে সেটিকে মুসলিম নিধন বলা তো দূরের কথা সেটিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলতেও তিনি নারাজ। তার মতে, গুজরাটে যা ঘটেছে সেটি একটি সহিংসতা। সেজন্যই বলেছিলাম যে,

রতনে রতন চিনেছে। বাজপেয়ী-আদভানী জুটি মুসলমানি নামের খোলসে প্রকৃতই একজন বিজেপি অনুরাগী পেয়েছে।

॥ তিন ॥

ওপরে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, ভারতীয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের লেখনী থেকে ডঃ আব্দুল কালামের যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পটভূমি বর্ণনা করা হলো সেই পটভূমিতে এখন ধর্মীয় পটভূমিতে এখন পরীক্ষা করা যায় কেন বিজেপি ডঃ আব্দুল কালামকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন দিয়েছে। কেনইবা কংগ্রেসও এই ইস্যুতে বিজেপিকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়েছে। যেসব কারণে এই মনোনয়ন দেয়া হয়েছে সেসব কারণের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে ঃ

১) গুজরাটের কলঙ্ক মোচন ঃ আগেই বলেছি যে, ১৯৯২ সালে বারবী মসজিদ ভাঙ্গার পর কংগ্রেসের মুখে সাম্প্রদায়িকতার চুনকালি পড়েছে। চূড়ান্ত পরিণামে কংগ্রেস ভারতের রাজনীতিতে হীনবল এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। গুজরাটের গণহত্যা এবং পাইকারী মুসলিম নিধন সারা ভারতের বিজেপির মুখে সাম্প্রদায়িকতার এবং মুসলিম হন্তার কালিমা লেপন করেছে। সেই কলংক মুছে ফেলে সেটিকে সাদা রং-এ চুনকাম করার জন্য মুসলিম নামধারী বৈজ্ঞানিক আব্দুল কালামকে প্রেসিডেন্ট পদে বসানো হয়েছে। এটি ভারতীয় মুসলমানদের ধোঁকা দেয়ারই এক অপচেষ্টা। ইতোমধ্যেই ভারতরে চারটি রাজ্যে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। চারটি প্রদেশেই বিজেপির ভরাডুমি হয়েছে। চারটি প্রদেশের একটি হলো উত্তর প্রদেশ। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতের রাজনীতিতে এই অমোঘ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে যে, আজ যে দল উত্তর প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ করবে কাল সেই দল দিল্লী অর্থাৎ ভারত নিয়ন্ত্রণ করবে। উত্তর প্রদেশ হারানোর পর মুসলমানদের চোখে ভেলকিবাজি লাগানোর জন্যই ডঃ আব্দুল কালামকে রাষ্ট্রপতি ভবনে বসানো হচ্ছে।

২) ডঃ আব্দুল কালামের মনোনয়ন কাশ্মীরে ভারতীয় দাবি প্রতিষ্ঠার এক ব্যর্থ প্রয়াস। ১৯৪৮ সালে দেশীয় রাজ্য জুনাগড়ের প্রধানমন্ত্রী (তখন বলা হতো দেওয়ান) শাহনেওয়াজ ভুট্টো পাকিস্তানে যোগ দেন। শাহনেওয়াজ ভুট্টো পাকিস্তানের মরহুম প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিতা। জুনাগড়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিলেন হিন্দু। অতএব, সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতিফলন দেখানোর অজুহাতে পণ্ডিত নেহেরু প্রধানমন্ত্রী শাহনেওয়াজের পাকিস্তানভুক্তি নাকচ করে দেন এবং জুনাগড়ে ভারতীয় সৈন্য পাঠান। এভাবে জুনাগড়ে ভারতভুক্ত হয়। কাশ্মীরের ৯৫ শতাংশ মানুষ মুসলমান। রাজা হরি সিং ছিলেন হিন্দু। মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগ দেন। হরি সিং-এর সিদ্ধানের বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিদ্রোহ করেন এবং অস্ত্র ধারণ করেন। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য

এবং হরি সিং-এর সিদ্ধান্তের সপক্ষে ভারত কাশ্মীরে সৈন্য পাঠায় এবং কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ দখল করে নেয়। এখন কাশ্মীরের ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ অক্ষত রাখার জন বৈজ্ঞানিক আব্দুল কালামকে বিজেপি প্রেসিডেন্ট পদে বসাচ্ছে।

৩) ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কারণের বাইরে আরো একটি কারণ রয়েছে। আব্দুল কালামের মনোনয়নের মাধ্যমে ভারত সরকার দেশের অভ্যন্তরে তাদের বৈজ্ঞানিকদের এবং দেশের বাইরে এই মর্মে একটি বার্তা পাঠালো যে, দেশের বৈজ্ঞানিকদের প্রকৃত কদর দেয়া হচ্ছে। যে ব্যক্তি 'ক্ষেপণাস্ত্র মানব' নামে খ্যাত, যে ব্যক্তি ভারতকে পারমাণবিক ক্লাবের সদস্য করার গৌরব দিয়েছেন সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে শুধুমাত্র বিজ্ঞানোর গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে না। তাদেরকে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও যথাযোগ্য মর্যাদা ও ক্ষমতার সাথে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানীরা নতুন উদ্যমে কাজ করার জন্য নতুন করে প্রেরণা পাবেন। এর ফলে ভারতে প্রতিরক্ষা উৎপাদন কর্মসূচি এবং ক্ষেপণাস্ত্র ও পারমাণবিক প্রকল্প আরো বেগবান হবে এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হবে। এই কলাম লেখার শেষ পর্যায়ে পত্র পত্রিকায় একটি খবর দেখলাম। খবরে বলা হয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদভানীকে উপ-প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সেই ব্যক্তি যিনি বিজেপিতে সংঘ পরিবারের প্রতিনিধ। তিনিই হলেন খাস লোক। তিনি এর আগে বিজেপির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি এক বিশাল রামমূর্তির নিচে দাঁড়িয়ে সারা ভারতে হিন্দুত্বের সপক্ষে রথযাত্রা করেছিলেন। সেই ব্যক্তিকে ১২ বছর পর উপ-প্রধানমন্ত্রী করা হলো। ১২ বছর আগে উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দেবিলাল। তার আগে ছিলেন মোররজী দেশাই। পরবর্তীতে তিনিও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তারও আগে ছিলেন সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল। চরম মুসলিম বিদ্বেষের জন্য সরদার প্যাটেলকে কে না জানে? যেমনি চরম মুসলিম বিদ্বেষের জন্য লালকৃষ্ণ আদভানীও 'মশহুর' হয়ে আছেন। ইতোমধ্যেই বলাবলি শুরু হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেলেন। ঠুঁটো জগন্নাথ তিনি আগেও ছিলেন। তখন আদভানী ছিলেন পর্দার অন্তরালে। এবার মঞ্চে এলেন। ক্ষমতার রাজদণ্ড এবার তাঁর হাতেই এলো। ভারতীয় সমরবাদের আওয়াজ এবার জোরদার হবে। কারণ, পতাকার নিচে জুটি বাঁধছেন আদভানী এবং আব্দুল কালাম। ভারতীয় সমরবাদের রাজযোটক লালকৃষ্ণ আদভানী এবং আব্দুল কালাম। ভারতীয় হিন্দুত্বের রাজযোটক–ক্ষেপণাস্ত্র মানব আব্দুল কালাম এবং সংঘ পরিবারের রামরাজ্যের প্রবক্তা লালকৃষ্ণ আদভানী। *দৈনিক ইনকিলাব, ২ জুলাই ২০০২।*

গুজরাটে দেড় লাখ মুসলমান এখনো আশ্রয় শিবিরে ঃ উগ্র হিন্দুরা তাদের ঘরে ফিরতে দিচ্ছে না

ভারতের গুজরাট রাজ্যে মারাত্মক ধরনের ধর্মীয় সহিংসতা সংঘটিত হওয়ার পর দু'মাসেরও বেশি সময় কেটে গেছে। কিন্তু এখনো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। এর ফলে মুসলমানরা ঘর ফিরতে পারছে না। বেসরকারি হিসাবে বলা হয়, দু'হাজারের বেশি লোক এই সহিংসতায় নিহত হয়। নিহতদের অধিকাংশই মুসলমান। এ রাজ্যের ৮০ ভাগেরও বেশি লোক হিন্দু। নিরপেক্ষ রিপোর্টে ভারতের ক্ষমতাসীন ডানপন্থী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকারের সমর্থনে সহিংসতা সৃষ্টির জন্য কট্টর হিন্দু সংগঠনগুলোকে অভিযুক্ত করা হয়। এখনো প্রায় প্রত্যেক দিন সেখান থেকে নতুন করে হত্যার রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে এবং আনুমানিক দেড়লাখ মুসলমান ত্রাণ শিবিরগুলোতে তাদের দিন কাটাচ্ছে। আহমেদাবাদ নগরীতে একটি মসজিদকে আশ্রয় শিবিরে পরিণত করা হয়েছে। ১৬ হাজার লোক প্রাণ রক্ষার্থে প্রাচীর পরিবেষ্টিত মসজিদ প্রাঙ্গণে গাদাগাদি করে অবস্থান করছে। দুই মাসেরও বেশি কাল ধরে এসব লোক আশ্রয় শিবিরে রয়েছে। প্রাণ রক্ষার জন্য তারা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয়।

তারা এখনো নিজেদের নিরাপদ মনে করে না। আশ্রয়প্রার্থী আব্দুল জব্বার বলেন, আমরা যখন আমাদের এলাকায় ছিলাম সে সময় দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি শুরু হয়। নিকটেই গুলীবর্ষণ চলছে এবং আহত মুসলমানদের হাসপাতালে নেয়ার আগে সাহায্যের জন্য শিবিরে আনা হচ্ছে। কোন কোন আহত ব্যক্তির চিকিৎসা করা হচ্ছে শিবিরেই। আরেক আশ্রয়প্রার্থীর নাম নাসির। তার হাত আগুনে মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়েছে। তিনি বলেন, হিন্দু জনতা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে আসে। তারা মুসলমানদের দোকান ও ঘর-বাড়িতে আগুন ধরাতে শুরু করে। মুসলমানরা যখন সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সে সময় হিন্দু পুলিশ মুসলমানদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। সাংবাদিকদের একটি দল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে মুসলিম নিধন দেখতে পান। পুলিশ কর্মকর্তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। কিন্তু হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য কোন কিছুই করছে না। পুলিশ যেখানে দাঁড়িয়েছিল তা থেকে ঠিক কয়েক গজ দূরে অবস্থিত সড়কে দু'জন মুসলমানের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। এদের একজন নিহত হয়েছে এবং অপরজন মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছে। কর্মকর্তারা পরে বলেন, কিছু মুসলিম পরিবার যখন ত্রাণ শিবির থেকে তাদের বাড়ি-ঘরে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সে সময় মুসলিম নিধন শুরু হয়। হিন্দু প্রধান এলাকা থেকে শিবিরে পালিয়ে আসা লোকজনের অধিকাংশই মুসলমান। স্থানীয় হিন্দুরা মুসলমানদের ঘরে ফিরে আসা বন্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ বলে মনে হয়েছে। অন্যান্য শিবিরের মুসলমানগণ একই

অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। আব্দুল জব্বারের মাথা ও মুখে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। তিনি বলেন, স্থানীয় ছয় ব্যক্তি তাকে প্রহার করে। পুলিশ তাদের থামানোর জন্য কোন কিছুই করেনি। হিন্দু জনতা চিৎকার করে বলছিল, কারা এখনো নিজেদের মুসলিম ভাবছে। তাদের হত্যা কর। নিকটেই রয়েছে একটি পুলিশ ফাঁড়ি এবং আব্দুল জব্বার সাহায্যের জন্য অনুনয়-বিনয় করছিলেন। তিনি শেষে হিন্দুদের উদ্দেশে বললেন, ওইখানে পুলিশ রয়েছে। তারা বলল, পুলিশকে আমরা পরোয়া করি না, তারা তো আমাদের পক্ষে রয়েছে। শুরু থেকেই মুসলমানরা হত্যাকাণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তামাশা দেখা এবং তাদের রক্ষার্থে এগিয়ে না আসার জন্য পুলিশকে অভিযুক্ত করে আসছে। ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের তৈরি করা নিরপেক্ষ রিপোর্টে এ কথার সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। দুই মাস পরেও গুজরাটে একই অবস্থা বিরাজ করছে। এ প্রসঙ্গে 'দি পাইওনিয়ার' সংবাদপত্রের প্রখ্যাত সাংবাদিক আর কে মিশ্র বলেন, কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। অনেকে একান্তে বলেন, হিন্দু প্রধান এলাকা থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করার জন্য বিজেপি সমর্থিত হিন্দু কট্টরপন্থীরা সযত্নে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বর্তমান সহিংসতা তারই একটি অংশ। খৃস্টান পাদরী ও মানবাধিকার কর্মী ফাদার সিডরিক প্রকাশ বলেন, আজ গুজরাটে মুসলমানদের জন্য বসবাসের কোন জায়গা নেই। এ রাজ্যের খৃস্টানরা ইতোমধ্যেই অনেকবার আক্রান্ত হয়েছে। খৃস্টানদের বিতাড়নেরও উদ্যোগ চলছে। শিগগিরই অন্য সংখ্যলঘুদের ওপরও হামলা চলবে। নাৎসী জার্মানীতে যা ঘটেছিল বর্তমানে ঠিক একই ঘটনা ঘটছে ভারতে। *সূত্র ঃ ইন্টারনেট।*

ভারতে মুসলমানবিরোধী অভিযান

ভারতের রাজ্য গুজরাট আবারও সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। মাত্র কিছুদিন আগে, ফেব্রুয়ারী (২০০২) শেষ দিক থেকে মে মাস পর্যন্ত এই একই রাজ্য গুজরাটের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করেছে, ভীত ও আতংকিত হয়েছেন বিশেষ করে মুসলমানরা। সেবার একটি অসত্য অভিযোগে সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যার নিষ্ঠুর অভিযান চালানো হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, মুসলমানরা নাকি একটি ট্রেনে আগুন ধরিয়ে একদল হিন্দু তীর্থযাত্রীকে হত্যা করেছিলেন। বৃটেনের মতো কয়েকটি রাষ্ট্রের ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে খোদ ভারতীয়দের তদন্তেও ঐ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। সকল তদন্তে বরং ভয়ংকর তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের জড়িত থাকার কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, প্রতিটি তদন্ত রিপোর্টেই অভিন্ন ভাষায় গুজরাটে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের

মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র নাথ মোদীকে দায়ী করা হয়েছে। অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেও দায়িত্ব এড়ানো সম্ভব হয়নি। প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহের পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রাজ্যের ক্ষমতা ধরে রাখার, বিজেপিবিরোধী হিসেবে পরিচিত মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত ও অবদমিত করার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণকে পক্ষে টেনে আনার উদ্দেশ্য থেকেই মুসলমান নিধনের নৃশংস কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ট্রেনে আগুন দেয়া থেকে মুসলমানদের ওপর দোষ চাপানো, উগ্র হিন্দুদের উস্কানি দেয়া ও হত্যার অভিযানে নামিয়ে দেয়া পর্যন্ত সবকিছুর পেছনে ছিল একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাও প্রণীত হয়েছিল কয়েক বছর আগে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার জড়িত ছিল বলেই পুলিশ ও প্রশাসন সে সময় অসহায় মুসলমানদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। পুলিশ ও প্রশাসনের লোকজন বরং হিন্দু ঘাতকদের সহযোগিতা করেছে। ফলে নারী ও শিশুসহ শত শত মুসলমান নারীর পেট চিড়ে গর্ভের সন্তানকে পর্যন্ত টুকরো টুকরো করেছে। একযোগে চলেছে মুসলমানদের বাড়ি-ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার এবং সম্পদ লুণ্ঠন করার ভয়াবহ অভিযান। উগ্র হিন্দুরা শত শত মক্তব, মাদ্রাসা, মাজার ও মসজিদ ধ্বংস করেছে- একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতার ভাষায়, 'মাটির সাথে পুরো মিশিয়ে দিয়েছে।' সব মিলিয়ে পরিস্থিতিকে এমন এক পর্যায়ে নেয়া হয়েছিল যে, সরকারের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসেবে দেখানোর প্রচেষ্টা চালানো হলেও বিবেকবান ভারতীয়রা একে মুসলমানবিরোধী গণহত্যা না বলে পারেননি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঔপন্যাসিক অরুন্ধতি রায় বলেছিলেন, এটা 'বিশুদ্ধ ভারতীয় ফ্যাসিবাদ'। হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে, কিন্তু গুজরাটে মাত্র সেদিন পর্যন্ত সংঘটিত হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সঙ্গত কারণ রয়েছে। এই কারণ সৃষ্টি করা হয়েছে গত ২৪ সেপ্টেম্বর। সেবার গোধরা রেল স্টেশনে একটি ট্রেনে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উস্কানি দেয়া ও মুসলমানবিরোধী অভিযান শুরু করানো হয়েছিল। এবার গান্ধীনগরের একটি মন্দিরে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। খবরে জানা গেছে, সেদিন সন্ধ্যায় দু'জন সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী মন্দিরে ঢুকে পড়ে এবং প্রার্থনারতদের লক্ষ করে নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করতে থাকে। তারা বোমা ও গ্রেনেডেরও বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বর্বরোচিত হামলায় ৩২ জন হিন্দুর মৃত্যু ঘটে, যাদের মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে। আহতদের সংখ্যাও ছিল ৫০ জনের বেশি। দুই সন্ত্রাসবাদী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার পর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মন্দির থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি; বরং মন্দিরের ভেতরে অবস্থান নিয়েছে– যাকে অবরোধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর এসেছে ভারতীয় সেনা ও কমান্ডোদের অভিযান চালানোর

পালা। ১৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অভিযান চালিয়ে তারা দু'জন সন্ত্রাসবাদীকেই হত্যা করেছে, মন্দিরও কথিত অবরোধ থেকে মুক্ত হয়েছে। একযোগে শুরু হয়েছে পাকিস্তান ও ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার প্রতিযোগিতা। কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে উল্লেখ করে নেয়া দরকার যে, গান্ধীনগরের আক্রান্ত মন্দিরটি কিন্তু ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উপাসনালয় নয়। এখানে পূজা ও প্রার্থনা করতে আসে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী নারায়ণের অনুসারীরা। এরা পৃথক একটি হিন্দু সম্প্রদায় এবং তাদের সঙ্গে ভারতের শাসকগোষ্ঠীসহ বর্ণ হিন্দুদের নানামুখী বিরোধ ও মতানৈক্য রয়েছে। প্রশ্ন ও রহস্যেরও সৃষ্টি হয়েছে একই কারণে। বলা হচ্ছে, এমনও হতে পারে যে, এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো ভয়ংকর কোনো কৌশল নেয়া হয়েছে- যার মাধ্যমে একদিকে ভিন্নমতাবলম্বী একটি হিন্দু সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করার মাধ্যমে পদানত করা যাবে এবং অন্যদিকে এ হত্যাকাণ্ডকে অজুহাত বানিয়ে নতুন পর্যায়ে মুসলমানবিরোধী অভিযান চালানো যাবে। কৌশলের আড়ালে উদ্দেশ্যের প্রথম দিকটি অবশ্য সামনে আসতে পারেনি। কারণ, বিরোধিতা ও মতপার্থক্য থাকলেও আক্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকজন সাধারণভাবে হিন্দু হিসেবে পরিচিত। এ পরিচিতিকে সুকৌশলে কাজেও লাগানো হয়েছে। সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো এমন প্রচারণাকে জোরদার করেছে, যেন পাকিস্তান কিংবা ভারতীয় মুসলমানদের বাইরে আর কোনো গ্রুপ বা গোষ্ঠী মন্দিরে গিয়ে হত্যাকাণ্ড চালায়নি। সরকার কিংবা বর্ণ হিন্দুসহ স্বার্থান্বেষী অন্য কোনো গোষ্ঠীও যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে থাকতে পারে, সে সম্ভাবনাকে প্রচারণার চমৎকার কৌশলের সাহায্যে ধামাচাপা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সফলতাও অর্জন করা গেছে সম্পূর্ণরূপে অন্তত ভারতের কোনো দল বা মহলের পক্ষ থেকেই হিন্দুবাদী গোষ্ঠীগুলোকে দায়ী করা হয়নি, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের দিকেও কেউ আঙ্গুল তোলেনি। সকলে বরং এমন ভাষায় দেশের কথিত শত্রুদের ওপর দায়-দায়িত্ব চাপিয়েছে, যা থেকে বুঝতে বাকি থাকেনি যে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই ভারতীয় মুসলমানদের টেনে আনা এবং দায়ী করা হয়েছে। সঙ্গে যথারীতি পাকিস্তানকে জড়িয়ে ফেলার ব্যাপারেও ভুল হয়নি।

ফলাফলও যেমন হওয়ার ঠিক তেমনই হয়েছে। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পরপর শুরু হয়ে গেছে মুসলমানবিরোধী নতুন ও ভয়ংকর অভিযান, খোলা তলোয়ার হাতে পথে নেমে এসেছে উগ্র হিন্দুরা। অন্য দিকে আবারও বিপন্ন হয়েছেন মুসলমানরা বাড়ি-ঘর ছেড়ে তারা গিয়ে মসজিদ, ত্রাণ শিবির ও মুসলমান প্রধান বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নিয়েছেন। জীবন বাঁচানোর তাগিদে

পালাতে গিয়েও অনেকে উগ্র হিন্দুদের আক্রমণের কারণে হাসপাতালে যাওয়ার কিংবা পুলিশ ও প্রশাসনের সাহায্য চাওয়ার সাহস পাননি। খবরে জানা গেছে, দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ভারতের সকল রাজ্যেই মুসলমানরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে সময় পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। বিশেষ করে গণহত্যার জন্য কুখ্যাত রাজ্য গুজরাটের সর্বত্র তাদের তাড়িয়ে বেড়ানোর অভিযান চলছে। বড়কথা, পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করার ও উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই অত্যন্ত ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করেছে। হিন্দু জনগণকে পক্ষে টেনে আনার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার আশংকা থেকে প্রথমে এগিয়ে এসেছে প্রধান বিরোধী দল ন্যাশনাল কংগ্রেস। হত্যাকাণ্ডের পরদিনই কংগ্রেস গুজরাট রাজ্যে বন্‌ধ ডেকে বসেছে, দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধী বিমানযোগে গিয়ে হাজির হয়েছেন গান্ধীনগরে। পাল্লা দিয়ে গেছেন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানী, মালদ্বীপ সফর সংক্ষিপ্ত করে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছেন। তিনি এমনকি রাজধানী নয়াদিল্লীতেও যাত্রাবিরতি করেননি। একযোগে এসেছে সারা ভারতে বন্‌ধ পালনের আহ্বান-ক্ষমতাসীন বিজেপির সঙ্গে বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল ও শিবসেনার মতো উগ্র হিন্দুবাদী সংগঠনগুলো ২৬ সেপ্টেম্বর বন্‌ধ পালনের ডাক দিয়েছে। গুজরাটের বাইরে অন্য কোনো রাজ্যে বন্‌ধ পালিত হয়েছে কি হয়নি, সেটা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বটে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য তথ্যটি হলো, মুসলমানবিরোধী উস্কানি দেয়ার প্রধান উদ্দেশ্য সফল হয়েছে সম্পূর্ণরূপে। ভারতীয় মুসলমানরা আসলেও বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।

শান্তি ও সম্প্রীতিকামী ভারতীয়দের পাশাপাশি আমাদের উদ্বেগের কারণও মুসলমানদের এই নিরাপত্তাহীনতা। আমরা উদ্বিগ্ন এজন্য যে, গান্ধীনগরের হত্যাকাণ্ডকে গোধরার সেই অগ্নিসংযোগের ঘটনার মতো মুসলমানবিরোধী গণহত্যা ও নির্যাতনের উপলক্ষ বানানোর প্রচেষ্টা লক্ষযোগ্য হয়ে উঠেছে। আর সবচেয়ে আশংকার কথা, হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করলে আমাদের উদ্বেগ ও আশংকার কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। যেমন, গোধরার ট্রেনে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের পর গুজরাটের সর্বত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে হত্যা ও নির্যাতনের অভিযান সর্বাত্মক হয়ে উঠলেও কোনো একটি প্রধান রাজনৈতিক দলই কার্যকরভাবে প্রতিবাদ জানায়নি। দিনের পর দিন ধরে, এমনকি প্রায় তিন মাস পর্যন্ত নিষ্ঠুর অভিযান চলার পরও রাজনৈতিক দলগুলো বিপন্ন ও অসহায় মুসলমানদের পাশে দাঁড়ায়নি। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল বিজেপি ও কংগ্রেসের ভূমিকা। এবার প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী আদভানীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সোনিয়া

গান্ধীও রাতারাতি গান্ধীনগরে ছুটে গেছেন। অথচ সেবার এই সোনিয়া গান্ধীই গুজরাটে যাওয়ার প্রয়োজনবোধ করেননি। তার এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সকল তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল রাজধানী নয়াদিল্লীতে। দু'টি মাত্র দাবীকে তারা প্রধান করেছিলেন- প্রথমত, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বরখাস্ত করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, গুজরাট প্রসঙ্গে বিতর্ক ও আলোচনার জন্য লোকসভার অধিবেশন ডাকতে হবে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দাবি ও তৎপরতার প্রেক্ষিতে মনে হয়েছিল যেন নরেন্দ্র মোদীকে বরখাস্ত করলে এবং লোকসভায় বিতর্কের সুযোগ দেয়া হলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, বিশেষ করে বন্ধ করা যাবে হত্যা ও নির্যাতনের অভিযানকে। অন্যদিকে বিজেপি সরকারের কৌশল ও ভূমিকাও ছিল লক্ষ করার মতো। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে ছাড় পেয়ে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী সেবার লোকসভার অধিবেশন ডাকতে যথেষ্ট গড়িমসি করেছেন এবং দীর্ঘ দু'মাস পর এমন এক সময়ে ডেকেছেন, মুসলমানদের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আর সে অধিবেশনের কোনো গুরুত্ব বা প্রয়োজন থাকেনি। গোধরার ঘটনা-পরবর্তী মুসলমানবিরোধী হত্যা ও নির্যাতনের নিষ্ঠুর অভিযানের মধ্য দিয়ে সেবার বেশ কয়েকটি কঠিন সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। এসবের মধ্যে প্রধান সত্যটি ছিল এই যে, সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি থাকলেও ভারতে এখনও হিন্দুবাদী ধ্যান-ধারণাই প্রাধান্যে রয়েছে এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো আসলে ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে পার্থক্য হলো কৌশলগত বিজেপি ও তার মিত্র দলগুলো যেখানে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, কংগ্রেস সেখানে নিচ্ছে চাতুরিপূর্ণ কৌশল। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে মুসলমানদের বাঁচানোর জন্য কার্যকর কোনো উদ্যোগ না নেয়ায়। বিজেপি সরকার যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র নাথ মোদীর পক্ষে দাঁড়ানোর পাশাপাশি সম্ভাব্য সকল পন্থায় উগ্র হিন্দুদের উস্কানি, প্রশ্রয় ও সমর্থন দিয়েছে, কংগ্রেস সেখানে গুজরাটে যাওয়ার পরিবর্তে নয়াদিল্লীতে বসে সীমিত আকারে তৎপরতা চালানোর মাধ্যমে প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই ঘাতকদের সমর্থন দিয়েছে, উৎসাহ যুগিয়েছে। এখানে প্রধান প্রশ্ন ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটারদের সমর্থন ধরে রাখার ও অর্জন করার বিজেপি ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রচেষ্টা চালিয়েছে, অন্যদিকে কংগ্রেস চেয়েছে যাতে হিন্দু ভোটাররা কংগ্রেসকে মুসলমানপন্থী দল হিসেবে চিহ্নিত না করে বসে। অর্থাৎ মুসলমানদের ব্যাপারে বিজেপি ও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবে কোনো পার্থক্য নেই। শুধু তাই নয়, ঘটনাপ্রবাহে একথাও প্রমাণিত হয়েছিল যে, হিন্দুবাদী ধ্যান-ধারণাকে এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনে কংগ্রেস এমনকি মুসলমানদের সমর্থন হারানোর ঝুঁকি নিতেও

প্রস্তুত রয়েছে। কারণ, গুজরাটের মুসলমানরা কংগ্রেসের ভোটব্যাংক হিসেবে পরিচিত থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস তাদের বিপদে এগিয়ে যায়নি। ফলে পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দেয়ার আগে মুসলমানরা দশবার চিন্তা করবেন, শেষ পর্যন্ত হয়তো ভোটই দেবেন না। কিন্তু এতেও কংগ্রেসের কিছু যায় আসে না। কংগ্রেসের দরকার শুধু হিন্দুদের আস্থা ও সমর্থন অর্জন করা, দলটি সে লক্ষ্যেই কৌশল নির্ধারণ করেছে এবং প্রায় প্রকাশ্যে মুসলমানদের ছুড়ে ফেলেছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বিজেপি সরকারের আমলেই প্রথম নয়, সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের আমলেও ভারতীয় মুসলমানরা বিভিন্ন রাজ্যে বহুবার হত্যাকাণ্ড, দাঙ্গা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, বিজেপি দৃশ্যপটেই এসেছে উগ্র হিন্দুবাদী দল হিসেবে, অন্যদিকে কংগ্রেস সবসময় ধর্মনিরপেক্ষতার খোলস জড়িয়ে রেখেছে। সেদিক থেকে কংগ্রেসকে মুসলমানদের জন্য অনেক বেশি বিপজ্জনক দল না বলে উপায় নেই।

বর্তমান পর্যায়েও হিন্দুবাদী কৌশলের ভিত্তিতে একই ধরনের তথা মুসলমানবিরোধী তৎপরতা শুরু হয়েছে। বাজপেয়ীরা তো গেছেনই, ছুটে গেছেন সেই নেত্রী সোনিয়া গান্ধীও- যিনি সেবার তিন-চার মাসের মধ্যেও মুসলমানদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর প্রয়োজনবোধ করেননি। অর্থাৎ ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়পক্ষই গেছেন প্রধানত হিন্দু জনগোষ্ঠীর সমর্থন ধরে রাখার ও অর্জন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। বলার অপেক্ষা রাখে না, উভয়পক্ষই প্রকারান্তরে মুসলমানদের জীবনকে বিপন্ন করে চলেছে। ধ্বংসাত্মক এই কৌশলের পরিণতি সম্পর্কে এখনও মন্তব্য করার সময় আসেনি। আমরা এখানে শুধু দু'টি কথা জানিয়ে রাখতে চাই-**এক.** প্রায় ২৫ কোটি ভারতীয় মুসলমানকে নির্মূল করা কিংবা অনির্দিষ্ট সময় ধরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হত্যা ও নির্যাতনের নিষ্ঠুর অভিযান চালানো সম্ভব নয়; এবং **দুই,** ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো বাস্তবে ঐতিহাসিক দ্বিজাতিতত্ত্বকেই সঠিক বলে প্রমাণ করে চলেছে। তারা এ কথাও বুঝিয়ে ছেড়েছেন যে, দ্বিজাতিতত্ত্ব ভারতের ক্ষেত্রে এখনও সমানভাবে প্রযোজ্য এবং ভারতীয়রা কোনো বিচারেই একক জাতি নয়। এর সঙ্গে অন্য একটি প্রশ্নও এসেছে অনিবার্যভাবে। প্রশ্নটি হলো, অটল বিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদভানী ও সোনিয়া গান্ধীর মতো মূলত হিন্দুবাদী ও মুসলিমবিদ্বেষী নেতা-নেত্রীদের পক্ষে কি এমন একটি রাষ্ট্রকে দীর্ঘদিন ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব?

উদ্ধৃতি ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০২ ॥ শাহ আহমদ রেজা।

গুজরাটে মুসলিম নিধনযজ্ঞ ও উপমহাদেশ

১২ এপ্রিল ২০০২ তারিখ শুক্রবার ভারতের গোয়া প্রদেশে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় নির্বাহী কমিটির বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের গুরু গোলওয়ালকরের দীক্ষা মোতাবেক মন্তব্য করেন, "মুসলমানরা গোঁড়া ও চরমপন্থী। হিন্দুরা সহনশীল ও অন্য ধর্মের প্রতি হস্তপেক্ষ করে না।... মুসলমানরা শান্তিতে থাকতে চায় না। শুধু তাই নয়। ১৭ মার্চ ২০০২ কর্নাটক রাজ্যের রাজধানী ব্যাঙ্গালোরে 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আর এসএস)-এর শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের সমাপনী দিনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে- "মুসলমানদের বুঝতে হবে যে, তাদের নিরাপত্তা হিন্দুদের শুভেচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।"

২২ জুন ২০০২ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দলের নেতা অশোক সিংঘাল মুসলমানদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন যে, "তারা যদি দেশকে বিভক্তির দিতে নিয়ে যেতে থাকে তাহলে তাদেরকে গুজরাটের মতো উদ্বাস্তু শিবিরে থাকতে হবে।"

এসব মুসলিম বিদ্বেষী এবং মুসলিম উৎখাতকামী সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করা হয়েছে যখন ভারতীয় জনতা পার্টিসহ অন্যান্য হিন্দু সংগঠনসমূহের উগ্র কর্মীবাহিনী কর্তৃক ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভেঙ্গে ফেলা বাবরী মসজিদের স্থানে রাম মন্দির নির্মাণ করার কার্যক্রম জোরদার হচ্ছে এবং গুজরাটের ৩৭ টির বেশি শহরে মুসলিম গণহত্যা, মুসলিম নারী ধর্ষণ, মুসলমানদের ঘর-বাড়ি, মসজিদ, দরগাহে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে।

এসব মন্তব্যের ব্যাখ্যায় যাওয়ার পূর্বে সম্প্রতি গুজরাটে মুসলিমদের ওপর নারকীয়, হৃদয়বিদারক, লোমহর্ষক গণহত্যা এবং আরও হরেক রকমের নির্যাতন সম্পর্কে ইন্টারনেট হতে প্রাপ্ত ভারতেরই প্রশাসনিক সার্ভিসের শান্তিকামী কর্মকর্তা 'হর্ষ মানদের' (Harsh Mandar)-এর ই-মেইলের বিবরণের দিকে কিঞ্চিৎ নজর দিচ্ছি। মুসলিম নির্যাতন ও মুসলমানদের সহায়-সম্পদের ক্ষতিসাধন সম্পর্কে হর্ষ মানদের ই-মেইলের সারাংশ হল, "গুজরাটের মুসলিম গণহত্যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এই বর্বরতার কাছে গত শতাব্দীর সব চিত্র ম্লান। মুসলিম অস্তিত্ববিনাশী প্রক্রিয়া এতটা নিকৃষ্ট ছিল যে, আট মাসের অন্তঃসত্ত্বার পেট চিরে তাঁর সামনেই সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। মুসলিম প্রধান এলাকার সর্বত্র চালানো হয় গণহত্যা ও গণধর্ষণ। মসজিদ ও দরগা মাটির সাথে এমনভাবে মিশিয়ে দেয়া হয়, দেখে মনে হবে তা এক ব্যস্ত মহাসড়কের অংশবিশেষ। আগুন দিয়ে, বিদ্যুৎ প্রবাহ ব্যবহার করে, স্ক্রু ড্রাইভার

দিয়ে খুঁচিয়ে এবং তলোয়ার দিয়ে জবাই করে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়।" এসব হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের নজির দেখে ভারতের শান্তিকামী এই প্রশাসনিক কর্মকর্তা (হর্ষ মানদের) আর কখনো গাইবেন না-"সাঁরে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা (অর্থ ঃ সারা দুনিয়ার মধ্যে ভারত সবচেয়ে সুন্দরতম দেশ)।"

হর্ষ মানদের মন্তব্য- "গুজরাট রাজ্যে ভীতি ও গণহত্যার আকস্মিক বিপর্যয়ের দশ দিন পর যেখান থেকে আমি ফিরে আসি নিদারুণ বিরক্ত ও ভীতিকর অবস্থায়।... আমার হৃদয় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অপরাধবোধ ও লজ্জার ভারে আমার মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।... গত শতাব্দীতে এই জাতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্বরতার কাছে একেবারে ম্লান হয়ে যায়। আমি যা দেখেছি ও শুনেছি তার সামান্য অংশ এখানে লিখতে বাধ্য হয়েছি। আমি মনে করি, এই ঘটনার দায়িত্ববোধ থেকেই আমি এ গুরুভারের কিছুটা অংশ বহন করেছি।" আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা যে মহিলাটি প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল, সে সম্পর্কে আপনি কি বলবেন। তার হত্যাকারীরা তার পেট চিরে ফেলে গর্ভের ভ্রূণকে বাইরে বের করে আনে এবং ঐ মহিলার সামনেই তাকে হত্যা করে। ১৯ জন সদস্যের যে পরিবারকে তাদের বাড়িতে পানি ঢেলে দিয়ে এবং তাতে উচ্চশক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহ সংযোগ করে হত্যা করা হয়, তাদের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন?

সম্প্রতি গুজরাটে বর্বরতার যে ব্যাপক প্রকাশ ঘটে তাতে মহিলাদের ওপর যৌন নির্যাতনকে হিংস্রতার একটা জঘন্য উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সব স্থানেই গণধর্ষণের খবর পাওয়া যায়। যুবতী ও মহিলাদের তাদের পরিবারের সদস্যদের সামনেই ধর্ষণ করা হয়। এরপর তাদেরকে অগ্নিদগ্ধ করে বা মুগুর দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।... আহমেদাবাদে আমি যেসব লোকের সাথে দেখা করেছি তাদের অধিকাংশই হল সমাজকর্মী, সাংবাদিক ও দাঙ্গায় আক্রান্ত বেঁচে থাকা লোক। তারা আমাকে জানায় যে, "গুজরাটে যে দাঙ্গা হয়েছে তা শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়,- এটা হল সংঘবদ্ধ ও পরিকল্পিত হত্যা এবং একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সন্ত্রাসী আক্রমণ। সবাই লুণ্ঠন ও লুটতরাজের কথা বলেছে, বিদেশী সামরিক বাহিনী কোন স্থান দখল করার পর যেভাবে লুটতরাজ সংঘটিত হয়, ঠিক সেভাবে। প্রথমে আসে একটা ট্রাক তাতে চড়ে থাকে একদল লোক- তাদের কণ্ঠে উত্তেজক স্লোগান। অতঃপর যুবক লোকদের নিয়ে আসে একাধিক ট্রাক। এসব যুবকদের অধিকাংশই ছিল খাকি প্যান্ট ও জাফরানী রং-এর পাগড়ি পরা অবস্থায়। তাদের কাছে ছিল অত্যাধুনিক বিস্ফোরণযোগ্য বোমা, দেশীয় অস্ত্র, ছোরা ও ত্রিশূল।... এদের মধ্যে যারা নেতা ছিল তাদেরকে মোবাইল টেলিফোনের সাহায্যে দাঙ্গা এলাকা থেকে কথা বলতে

দেখা গেছে। সমন্বয়কারী কেন্দ্রের সাথে তারা যোগাযোগ করছিল- নির্দেশ গ্রহণ করছিল এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য জানাচ্ছিল। অনেককে দেখা গেছে কাগজপত্র ও কম্পিউটার মুদ্রিত তালিকা হাতে। তারা মুসলিম পরিবার ও তাদের সম্পত্তির তালিকা মিলিয়ে দেখছিল। সম্পদশালী মুসলমানদের বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথমে অত্যন্ত সংঘবদ্ধভাবে লুট করা হয়, সমস্ত মূল্যবান বস্তুকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে ফেলা হয় এবং তারপর কয়েক মিনিট ধরে ঐসব গৃহে সিলিন্ডার থেকে রান্না করার জন্য ব্যবহৃত গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। দলের কোন প্রশিক্ষিত সদস্য অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ইস্পাতের ওয়েল্ডিং কাজে ব্যবহৃত ইসিটিলিন গ্যাসও ব্যবহার করা হয়। (উৎস ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ৪ এপ্রিল ২০০২)

হর্ষমানদের বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা ও সহায়-সম্পদ ধ্বংস করা ছিল পূর্বপরিকল্পিত যা শাসক দল বিজেপি'র ছত্রছায়ায় আরএসএস, বজরং দল, শিবসেনা ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নামক উগ্রহিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মী এবং সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এদের সাথে যোগ দিয়েছিল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে ভারতের মুম্বাইস্থ Center for study of society and Secularism নামক সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার তাঁর "The Gujarat Carnage" নিবন্ধে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও তার মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের গণহত্যা ও লুটপাটে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, Many ministers of this Narendra Modi Govemment are deeply involved in organizing the genocide. Mr. Zadaphia Home Minister and Hiran pandya. the Revenue Minister were seen by many eye-witnesses with the marauding mobs. some FIRS also have mentioned their name.

ভাবানুবাদ ঃ নরেন্দ্র মোদী সরকারের অনেক মন্ত্রী গণহত্যার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জদাফিয়া এবং রাজস্বমন্ত্রী হিরণ পান্ডেকে অনেক প্রত্যক্ষদর্শী লুটতরাজকারী জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লুটপাটে অংশ নিতে দেখেছে। অনেক অভিযুক্তকারী FIRS-ও তাদের নাম উল্লেখ করেছে। (উৎস ঃ Daily Star. April 19. 2002, Page no. 4) লুটতরাজে অংশগ্রহণকারী ও হত্যাকারীরা মুসলিমদের মনে করছে শত্রু এবং একক হিন্দু ধর্মীয় আদর্শিক রাষ্ট্র (রাম রাজ্য) প্রতিষ্ঠার অন্যতম বাধা। ভারতে বৃটিশ দূতাবাসের কর্মকর্তাদের গোপন রিপোর্টে গুজরাটের মুসলিম গণহত্যা সম্পর্কে

বলা হয়েছে, "গুজরাটে মুসলমানদের ওপর চলছে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান।" বিবিসি ও ইন্টারনেট হতে প্রাপ্ত এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে- "গুজরাটের সাম্প্রদায়িক বর্বরতা কোন ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ঘটেনি; বরং এটা ছিল পরিকল্পিত। সম্ভবত কয়েক মাস আগেই এ ঘটনার নীলনকশা করা হয়েছিল।... এই নীলনকশার লক্ষ্য ছিল হিন্দু এলাকাগুলো থেকে মুসলমানদের জোর-জবরদস্তি ও সহিংসতা উচ্ছেদ করা। (ইত্তেফাক, ২৭ এপ্রিল ২০০২, ১ম পৃষ্ঠা)

'কম্যুনিজম কমব্যাট' নামক ভারতের একটি নেতৃস্থানীয় বেসরকারি সংস্থার অভিমত, "গুজরাটের মুসলিম গণহত্যায় কর্তৃপক্ষের হাত ছিল।" এই সংস্থা গুজরাটে সরকারের ইন্ধনেই গণহত্যা শুরু হয়েছে– এ বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণ দিয়ে ১৫০ পৃষ্ঠার 'গণহত্যা-২০০২' নামক প্রতিবেদন তৈরি করে ২৫ এপ্রিল ২০০২ তারিখে নয়াদিল্লীতে প্রকাশ করেছে। এই সংস্থার অন্যতম সদস্য মিসেস ভিস্তা সেতলবাদ বিবিসিকে বলেন, উগ্র হিন্দুরা পুলিশ ও অন্যান্য সরকারি দফতরকে ঐ দাংগায় সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। পুলিশ কর্মকর্তারা দাঙ্গা দমনে তেমন কোন ভূমিকাই পালন করেনি; বরং রাজ্যসরকারও ঐ দাঙ্গায় স্পষ্টতই পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করে।" এই সংস্থার গণহত্যা-২০০২' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "দাঙ্গার পর জীবিতদেরকে দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে কোন মামলা পর্যন্ত দায়ের করতে দেয়া হয়নি। এসব ক্ষেত্রে পুলিশ দাঙ্গাবাজদের শনাক্ত করতে পারলেও তাদের নাম ঠিকানা যাতে এজাহারভুক্ত না হয় সেজন্য এজাহারকারীদের প্রথমেই ভয়-ভীতি দেখায়। পুলিশকে কর্তৃপক্ষ প্রথমেই এ কথা জানিয়ে দেয় যে, আতংকগ্রস্ত হয়ে কেউ পুলিশের সাহায্য চাইলে তাদের সেভাবে যেন খুব বেশি সাড়া না দেয়া হয়। পাঁচ থেকে পনের হাজার সশস্ত্র লোক যা করতে চায় তাদেরকে সেটা করার ব্যাপারে যেন বাধা দেয়া না হয় এবং এসব ব্যাপারে যেন কেউ কোন অভিযোগ দায়ের করতে না পারে, সেদিকেও পুলিশকে নজর রাখতে বলা হয়।"

ভারতের গুজরাটের গণহত্যাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি এবং কাশ্মীর সীমান্তে সন্ত্রাস দমন উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তুমুল হৈ-চৈ শুরু করা হয়। হত্যাকাণ্ডের সাথে প্রকাশ্যে সমর্থন ব্যক্তকারী নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে নতুন ধরনের সন্ত্রাস দমন আইন (পোটো) ভারতের পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে অধিবেশন ডেকে ১লা এপ্রিল ২০০২ তারিখে পাস করা হল। এ আইন পাসের সাথে সাথেই মুসলিম সংগঠন এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের ঝাঁকে ঝাঁকে গ্রেফতার করা হল। কিন্তু গণহত্যার উদ্যোক্তা ও অংশগ্রহণকারী সংঘ পরিবারের হিন্দু কোন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হল না।

অতএব, এতেই ধারণা করা যাচ্ছে, পরিকল্পিতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর উস্কানি দেয়া, হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পরিকল্পিতভাবে অজুহাত সৃষ্টি করা, হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য ও হত্যাকারীদের প্রত্যক্ষ প্রশয় ও সমর্থন দেয়ার অপরাধে কাউকে গ্রেফতার করা হল না।

গোয়া প্রদেশে ১২ এপ্রিল ২০০২ তারিখ শুক্রবার বিজেপি'র নির্বাহী কমিটির বৈঠকের আগে ও পরে বিজেপি সরকারের শরীক দলের নেতা-কর্মীরা গুজরাটের মুসলিম গণহত্যার মূল নায়ক নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগ দাবি করার পরও আরএসএস-এর সাংগঠনিক ও তাত্ত্বিক নেতা গুরু গোলওয়ালকরের শিষ্য অটল বিহারী বাজপেয়ীর জোরালো মন্তব্য নরেন্দ্র মোদীকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে বহিষ্কারের সম্ভাবনা নেই। ভারতের গুজরাটের গণহত্যাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি এবং কাশ্মীর নিয়ে একটা মুসলিমবিরোধী উন্মাদনা সৃষ্টি করেন।

আর নরেন্দ্র মোদী এতে উৎসাহিত হয়ে মন্তব্য করেন যে, মুসলমানরা উদ্বাস্তু শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করলে করুক এতে সরকারের কিছুই করার নেই। কেন বাজপেয়ী হত্যাকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল? তার কারণ খোঁজার জন্য বাজপেয়ীর শীর্ষ গুরু মাধব সদাশিব রাও গোলওয়ালকর, হিন্দু ধর্মতাত্ত্বিক শ্রী চৈতন্য দেব, বৈদিক ব্রাহ্মণ শাসিত মনু সংহিতার সমাজের আধিপত্যকামী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণা প্রচারের প্রবক্তা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

বাজপেয়ীর দীক্ষাগুরু গোলওয়ালকরের উদ্ধৃতি দিয়েই শুরু করছি। তিনি ভারতের অহিন্দুদের অধিকার সম্পর্কে মন্তব্য করতে দিয়ে বলেন,

"The non-Hindu peoples in Hindustan must adopt Hindu culture and language, must either leam to respect and rold in reverence Hindu religion, must entertain no ideas but those of glorification (i.e.) they attitude of intolerance and ungratefulness towards this land and its age-long traditions but must also cultivate the positive attitude of love and devotion instead in a word, the must cease to be foreigners or may stay in the county, wholly sub-ordinate to the Hindu Nation, claiming nothing, deserving no privileges, farless any preferential treatment no even citizen's right"

ভাবানুবাদ ঃ "ভারতের অহিন্দু জনগণকে অবশ্যই হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাষা গ্রহণ করতে হবে; অথবা সম্মান করা শিখতে হবে এবং বাস্তব জীবনে হিন্দু ধর্মকে

সম্মান করতে হবে। ভারতের প্রতি অনুদারতা ও অকৃতজ্ঞতামূলক ধারণা ত্যাগ করতে হবে, যাতে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়। সহজ কথায় হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভালবাসা ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে হবে। অহিন্দুদের অবশ্যই বিদেশী বা অস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী হিসেবে ভারতে বসবাস করতে হবে, পুরোপুরি হিন্দু জাতির অধীন হয়ে থাকতে হবে। কোন বিশেষ সুবিধা, উপযুক্ত প্রতিবিধান, অগ্রাধিকার, সদাচরণ প্রভৃতি দাবি করা তো দূরের কথা, সামান্যতম নাগরিক সুযোগ সুবিধাও অহিন্দু জনগণ দাবি করতে পারবে না।"

(উৎস ঃ এম এস গোলওয়ালকরের লেখা We as our Naticnhood defined, 4th edition, Nagpur, India, Bharat prakash 1947, page 55-56)

তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই উপমহাদেশ ভাগ হয়েছে এবং তামাম উপমহাদেশে অশান্তি ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে কেবল বর্তমান ভারতে নয়, তামাম উপমহাদেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ গড়ে উঠতে পারবে না। এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দের কথা বলা উচিত।

একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রতিবেশী মনুসংহিতার সমাজ পাক-ভারত-বাংলাদেশ, এই উপমহাদেশের কোথাও জাতি হিসেবে মুসলমানদের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জাতিসত্তা নির্মূল করাই তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। গুজরাটের এবং বোম্বের মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি সারা ভারতের মুসলমানদের সম্পর্কেও, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদের সম্পর্কেও। মনে রাখতে হবে, মনুসংহিতার সমাজ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানকে মেনে নিয়েছিলেন নিতান্তই অস্থায়ীভাবে এবং সেটা এই শর্তে যে, এর পরও মুসলমানদের তারা আলাদা জাতি হিসেবে মেনে নিচ্ছেন না।

উদ্ধৃতি ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২০ জুলাই ২০০২ ॥ লেখক ফখরুল ইসলাম।

বর্ণবাদীরা যখন নিরপেক্ষ

ড্রয়িংরুমে অতিথির সাথে আলাপচারিতার ঢং-এ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রাগ সঙ্গীতের মনোজ্ঞ আলোচনার অনুষ্ঠান চলছিল ভারতীয় একটি টিভি চ্যানেলে। আলোচক ছিলেন অজিত চক্রবর্তী এবং উপস্থাপক ছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। নানা প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠে এসেছিল। এর মধ্যে ছিল কেন প্রাচ্যের রাগ সঙ্গীত

এখনো শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। প্রাচ্য, প্রাচ্যের মেজাজ-মর্জি এবং পাশ্চাত্য রাগের মেজাজ-মর্জি নিয়েও বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা জমে উঠেছিল। সম্ভবত আলোচনার এটিই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল না। আর সে কারণে হয়তো প্রধান বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো আলোচনার শেষপ্রান্তে। অনুষ্ঠান শেষের মাত্র মিনিটখানেক আগে উপস্থাপক ঋতুপর্ণ ঘোষ মিঃ চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা পণ্ডিতজি! এই যে সঙ্গীতের ডিগ্রি প্রদানে পণ্ডিত ও ওস্তাদ পদ্ধতি রয়েছে একে বাদ দিলে হয় না। আপনিও তো ওস্তাদ হয়ে যেতে পারেন। এই কারণেই গুজরাট হয়।

গুজরাট প্রসঙ্গ এবং ওস্তাদ ও পণ্ডিতের মধ্যে ঋতুপর্ণ ঘোষ যে মিল খোঁজার চেষ্টা করেছেন তা আসলে রাজনৈতিকভাবেও সত্য। এই সত্য কথাটা তুলে ধরার পেছনে আসল যে উদ্দেশ্যটি রয়েছে সেটি বিশ্লেষণ না করলেই নয়, গুজরাট প্রসঙ্গ মানেই এক ভয়াবহ তাণ্ডব, গুজরাট মানেই মুসলিম গর্ভবতী মায়ের পেট থেকে সন্তান বের করে মেরে ফেলা, মায়ের সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করা, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে গণধর্ষণ করা এবং অগণতি মুসলিম নারী-শিশু-বৃদ্ধকে আগুনে পুড়িয়ে মারা। গুজরাট প্রসঙ্গ এলেই বাবরী মসজিদ প্রসঙ্গ এবং সেই পথ ধরেই এগুতে থাকে গত ৫০ বছরে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নামে লাখ লাখ মুসলিম নিধনের বীভৎস চিত্র, যেখানে কেবলমাত্র মুসলমান নাম হওয়ার অভিযোগে, মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়ার অপরাধে বর্বর আক্রমণের শিকারে পরিণত হতে হয়েছে হিন্দুত্ববাদীদের হাতে। ভারতের এই বর্বর-অমানবিক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কোন তুলনা যদি করতে হয় তাহলে তার জন্য একমাত্র উদাহরণ হলো মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদীরা। মধ্যপ্রাচ্যে যাদের জন্ম তাদেরকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার শয়তানি পরিকল্পনার সাথে কেবলমাত্র ভারতীয় চক্রান্তের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। এই দু'টি দেশের মধ্যে মুসলিম নিধনের ব্যাপারে আরও অনেক বিষয়ে ঐক্য রয়েছে। মুসলিমবিদ্বেষী এবং ডি-মুসলিমমাইজ করার দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নে দেশ দু'টির মধ্যে রয়েছে আশ্চর্য সমন্বয়। এ নিয়ে দু'দেশের গোয়েন্দাদের মধ্যেও রয়েছে মতবিনিময়ের ব্যবস্থা। মুসলিম বিশ্বের ওপর আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই দু'টি দেশের আরও যেসব প্রসঙ্গ সামনে আসে তাহলো এই যে, দু'টি দেশের নেতৃবৃন্দই মনে করে, যে যত বেশি মুসলিম নিধন করতে পারবে সে তত বড় হিন্দু অথবা ইহুদী। গুজরাটের মুসলিম নিধন যখন একটু কমে আসছে, ঠিক তখনই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে প্যালেস্টাইনের মুসলিম হত্যাকাণ্ড। এমনকি মার্কিন প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত বলে ফেলেছেন, তিনি ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে কথা বলবেন না। সেখানে এখন প্রতিদিন চলছে ইহুদী আক্রমণের তাণ্ডব। শেষ পরিণতি কি

দাঁড়াবে তা হয়তো এখনই বলা যাবে না। তবে মার্কিন পরিকল্পনা যে ইহুদী পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখেই করা হচ্ছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ইহুদীরা যখন জনাব ইয়াসির আরাফাতকে সন্ত্রাসী বলে গালি দিচ্ছে ঠিক তখনই মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার সাথে কথা বন্ধ করে দিলেন এবং ফিলিস্তিনের নেতৃত্ব পরিবর্তনের আহ্বান জানান। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এসব বক্তব্য-বিবৃতির মধ্যে কোন পূর্বাপর মিল খুঁজে না পাওয়া গেলেও অবাক হবার কিছু নেই। হতে পারে আরও কিছু কারণ এর পেছনে রয়েছে সে ভিন্ন কথা। অথবা মার্কিনীদের সামাল দিতে বেসামাল হয়ে মার্কিন জনগণের এই প্রেসিডেন্ট কোন বড় ধরনের বেকায়দায় পড়েছেন কিনা সেটিও অবশ্য তাদের নিজস্ব কৌশলের ব্যাপার। এইটুকু বলা যায় যে, দীর্ঘদিনের অনুসৃত মার্কিন নীতিতে কোথাও একটা বড় ধরনের গোল বেঁধেছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অন্তত সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্যের নীতি এই সত্যই প্রমাণ করে। শেষমেশ মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি যে দিকেই মোড় নিক না কেন, এটা খুব বাড়িয়ে বলা হবে না যে, চলমান মার্কিন নীতি বর্তমান বিশ্বকে একটি বিপজ্জনক পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

গুজরাটের বর্বর হত্যাকাণ্ডের পেছনে কারা ছিল সে ব্যাপারে এখন আর কোন মহলেরই সন্দেহ নেই। তখনও যেমন বিজেপিকে দায়ী করা হয়েছে এখনও তেমনি তাদেরকেই অভিযুক্ত করা হচ্ছে। গুজরাট হত্যাকাণ্ডের পরিণতিতেই চরম মুসলিমবিদ্বেষী লালকৃষ্ণ আদভানীকে উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে মূলত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বই দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, আরও কিছু দিনে ভারতীয় রাজনীতিতে হয়তো আরও কিছু পরিবর্তন স্থান করে নেবে। দিন যতই এগুবে সেখানকার পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে বাধ্য। ভারতে মুসলিম নিধনের ব্যাপারে সেখানকার বিরোধী দলগুলোর মধ্যেও মতৈক্য রয়েছে। বিগত আমলে যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল তখনও সেখানে মুসলিম নিধনে কোন সমস্যা হয়নি। বর্তমান সময়ের সাথে কংগ্রেসের পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, তখন ক্ষমতা থেকে মুসলিম নিধনে মদদ দেয়ার কথা প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করা হয়নি। এখন করা হয়। আর সেই সাথে ডি-মুসলিমাইজ করার জন্য এখন প্রকাশ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বাবরী মসজিদ কংগ্রেস আমলেই ভাঙ্গা হয়েছিল এবং বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার মধ্যদিয়েই ভারতের নয়া মুসলিমবিদ্বেষী রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্থান হয়েছিল।

ভারতের এই মুসলিম নিধন প্রক্রিয়া গত অর্ধশতাব্দীর। ইংরেজ প্রবর্তিত ভারত শাসননীতির রাজনৈতিক উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করার পর থেকেই কংগ্রেস কর্তৃক ভারত শাসননীতির অধীনেই ভারতে মুসলিম নিধন নীতি গ্রহণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার শেষ পরিণতি যে ডি-মুসলিমাইজেশনে সমাপ্তি হতে পারে বা

হওয়া উচিত সে কথা যে কোন রাজনৈতিক বিশ্লেষকই একমত হবেন। ভারতকে ডি-মুসলিমাইজ করার এই প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য ভারতীয়রা স্পেনের অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাতে চায় বলে অভিযোগ রয়েছে। যে স্পেন এক সময় মুসলিম সভ্যতার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল, সেই স্পেনে এখন আর হয়তো কোন মুসলমানই খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুসলিম সভ্যতার প্রধান প্রধান নিদর্শন পর্যন্ত সেখানে মুছে ফেলা হয়েছে। ভারতবর্ষেও মুসলমান শাসনের ইতিহাস কয়েকশ' বছরের। দিল্লি থেকে শুরু করে বর্তমান ভারতের প্রতিটি অলি-গলিতে রয়েছে মুসলিম শাসনের স্মৃতিচিহ্ন। এই সবের অনেক কিছুই তারা মুছে ফেললেও এখনো ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ কথাই স্বীকৃত যে, মুসলমনরাই সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধ ভারত প্রতিষ্ঠিত করেছে। কোন জোর-জুলুম, নির্যাতন-রক্তপাত বা বলপ্রয়োগ করে তা করা হয়নি। এমনকি ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়তে গিয়ে কোথাও কোন অমুসলিমকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টাও করা হয়নি। আর সেই ভারত থেকে মুসলিম নিধন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই মুসলমানের নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজ চলছে ঠিক তখন যখন মার্কিন নিয়ন্ত্রিত বিশ্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলছে এক সুগভীর চক্রান্ত। কয়েক বছর আগে বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে ইসরাইলী এক নেতা বলেছিলেন, যে যত বেশি মুসলিম হত্যা করতে পারে সে তত বড় ইহুদী। অন্যদিকে বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট মুসলিম হত্যাপর্বে এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্রাভিনেত্রী শাবানা আজমী বলেছিলেন, এই প্রথমবার আমি টের পেলাম যে, আমি একজন মুসলমান। কারণ আমি আক্রান্ত। বিশ্বব্যাপী মুসলিমবিরোধী ফ্যাসিবাদের যে উত্থান হয়েছে সেই দলের অন্যতম শরীক ভারতীয় ফ্যাসিস্টরা।

ঋতুপর্ণ ঘোষ গুজরাট সংকটের কারণ হিসেবে ওস্তাদ অর্থাৎ মুসলমানী একটি পদবিকে বাদ দেয়ার বাহানা তুলেছেন। অথচ তিনি নিজেও জানেন যে, গুজরাটে আক্রমণকারী হচ্ছে ভারতীয় হিন্দুরা। ভারতের প্রধান সমস্যা ধর্ম এবং অধর্ম নয়। অর্থাৎ মুসলমান এবং অমুসলমান নয়। ভারতীয় মুসলমানরা অথবা দুনিয়ার কোন মুসলমানরা বর্তমান বিশ্বের সমস্যা অথবা সংকট সৃষ্টির জন্য কোনক্রমেই দায়ী নয়। বর্তমান বিশ্বের প্রধান সমস্যা হচ্ছে পুঁজির শোষণ। বর্ণবাদ এই শোষণের একটি অন্যতম হাতিয়ার। এই বর্ণবাদ সমস্যার মূলেও রয়েছে ইংরেজরা। দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বর্ণবাদের নানা রূপ থাকলেও ভারতের বর্ণবাদী রূপটি হচ্ছে ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের ওস্তাদ পণ্ডিতের বিভেদের চেয়েও প্রাচীন। এই বিবাদ একেবারেই মনুষ্য সৃষ্ট। অর্থাৎ সমাজে কেউ কেউ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়েই কেবলমাত্র শ্রেণী

পেশাকে ভিত্তি করে বিভক্ত করে রেখেছে সমাজকে। বর্ণ-বৈষম্যের নামে মানুষকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে যেখানে মানবতা বড় কথা নয়; বরং জন্মসূত্রই বড় কথা। অথচ মুসলমানরা সমাজের সকল শ্রেণী বিভেদকে অস্বীকার করে একক মানুষের সমাজে বিশ্বাসী। সম্ভবত মুসলমানদের এই বিশ্বাসই ভারতীয় হিন্দু তথা বর্তমান বিশ্বে মুসলিম বিদ্বেষীদের মুসলমানদের ওপর আক্রমণের অন্যতম কারণ।

মানুষের বৈষম্যকে উস্কে দেয়া বা তা লালন করা একটি গর্হিত অপরাধ। সঙ্গীত আলোচনার নামে মুসলিম নিধন আলোচনাকে যদি কোন ধরনের বুদ্ধিভিত্তিক আলোচনা বলে মেনে নিতে হয় তাহলে বলতে হবে, এ হচ্ছে কুবুদ্ধির আলোচনা। অথচ বর্তমান দুনিয়ার তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিত মানুষেরা এই আলোচনাকে প্রগতিবাদী মুক্তবুদ্ধির আলোচনা বলে মনে করে থাকেন। দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের দেশেও এই দুর্বুদ্ধির মতাদর্শের সংখ্যা একেবারেই কম নেই। যারা মুসলমান নাম দেখলেই আঁতকে উঠেন। তবে ঋতুপর্ণ ঘোষসহ সকলেরই জানা উচিত যে, সভ্যতার সংকট অধর্মে-ধর্মে নয়।

উদ্ধৃতি ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ৭ জুলাই ২০০২ ॥ লেখক আবদুল আউয়াল ঠাকুর।

এই তথ্যসন্ত্রাস আর মুসলিম নির্যাতনের অবসান চাই

দেশ বিভাগের পর থেকেই যে একটি মুসলিম বিদ্বেষী গোষ্ঠী শক্তি সঞ্চয় করছিল এবং এদের মুসলিম বিদ্বেষ যে কত প্রচণ্ড ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্বাধীনতার পরপরই দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে একটি বাংলা দৈনিক রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে একটি অবমাননাকর প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সমসাময়িক পরিস্থিতিতে বা ঘটনার সাথে অপ্রাসঙ্গিক এই প্রবন্ধটির একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল মুসলিম বিশ্বাসে আঘাত হানা। কিন্তু ঘটনাটি এক রক্তাক্ত যুদ্ধে ক্লান্ত এবং সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে বিভোর জনগণের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। পরবর্তীকালে যখন সাহস পেয়ে ঐ পত্রিকাটি রসূলুল্লাহর প্রতি অবমাননাকর একটি কবিতা বের করে তখন জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যেহেতু তৎকালীন রাষ্ট্রীয় কর্ণধার শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মুসলিম পরিচিতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, সেইজন্য তার হস্তক্ষেপের ফলে সমস্যার কিছুটা সমাধান ঘটে। এই ঘটনার পর মুসলিম বিদ্বেষীরা তাদের কৌশল পরিবর্তন করে, যদিও মূল টার্গেটটি তারা ঠিক রাখে। এখন আর সরাসরি ইসলামকে আক্রমণ নয়- অবশ্য একেবারেই যে বন্ধ হয়েছে তা নয়; বরং একটু ঘুরিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে। যথা- মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যালঘু নির্যাতনের কল্পকাহিনী বানিয়ে যেমন একদিকে বিশ্বের কাছে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ

সম্প্রদায়কে হীনবর্ণে চিত্রিত করে সর্বদা তাদের বিব্রত, apologetic বা রক্ষণাত্মক ভূমিকায় ঠেলে দিচ্ছে, অপরদিকে মুসলিম সংস্কৃতির বিপরীতে হিন্দু সংস্কৃতি (মঙ্গল প্রদীপ, কাঁসর ঘণ্টা) মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়; মুসলমান নামধারী এবং ইসলাম অনুসারীর ভেক ধরে ইসলামী শরীয়ত ও বিশ্বাসের ওপর বই লেখে। এগুলো যে সরল বিশ্বাসী মুসলিম জনগণকে শুধু বিভ্রান্ত করার জন্যই লেখা তা বোঝা যায়। এই বইগুলো শুধু সেইসব পুস্তকালয়েই পাওয়া যায় যেগুলোর মালিকানা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে রয়েছে।

এসব তথ্য যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, এদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ই বিভিন্নভাবে মানসিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। বাংলাদেশই পৃথিবীর একমাত্র মুসলিম দেশ, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে নামায পড়ার জন্য নির্যাতিত হতে হয়, যেখানে জুতা পায়ে মসজিদে ঢুকে পুলিশ নামাযরত নিরীহ মুসল্লিদের লাঠিপেটা করে। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যেখানে একজন হিন্দু লেখিকা মুসলিম শিষ্টাচার আসসালামু -আলায়কুমের বদলে নমস্কার বা সুপ্রভাত বলবার নসীহতদান করতে পারে এবং সেটি সরকারেরই একটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশিত হয়। এদেশেই একজন হিন্দু সাংবাদিক প্রকাশ্যে মাদ্রাসা মক্তবের শিক্ষা চালু থাকলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না বলে হুংকার দেয়, একজন হিন্দু নেতা মুসলমানদের রক্ত কালী-মায়ের পায়ে অর্পণ করার ঘোষণা দেয়; একটি চরম মুসলিমবিদ্বেষী সংগঠন প্রকাশ্যে মুসলমানদের নামের আগে মুহাম্মদ বা আলহাজ্ব ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে বিচার করলেই প্রমাণিত হবে নির্যাতিত হচ্ছে কে সংখ্যালঘু না, সংখ্যাগরিষ্ঠরা।

এ তো গেল সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও মানসিক নির্যাতনের কথা। এছাড়া অর্থনৈতিক নির্যাতনও কম হচ্ছে না। যেসব NGO সরাসরি বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত সেখানে সবার আগে খ্রিষ্টান, তারপরে হিন্দু এবং সাধারণত নিম্নপর্যায়ে মুসলমানদের নেওয়া হয়। সংবাদপত্র ও টিভিসহ যেসব মিডিয়া ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তারস্বরে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কাহিনী প্রচার করছে সেসব প্রতিষ্ঠানে অর্ধেকের বেশি চাকরি দেওয়া হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের। জনসংখ্যার অনুপাত হিসাব করলে দেখা যাবে, এভাবে কেমন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের চাকরি হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে। একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক NGO'র বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রের লিষ্ট আমার হাতে এসেছিল। দেখি শাখা কেন্দ্রগুলোর শতকরা ৬৫ ভাগ প্রধান হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। এমনকি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও মুসলমানরা কম বৈষম্যের শিকার হচ্ছে না। খুব

সাম্প্রতিক ঘটনা হচ্ছে, একটি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যে পরীক্ষক নিযুক্ত করেছে, তার ১২ জনের মধ্যে ১১ জনই হিন্দু। পাঠককে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না বঞ্চিত হচ্ছে কারা? এখন বলুন, সত্যিকারের Protection প্রয়োজন কার? সব পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত কোন মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রভাষক পদ পাওয়ার কথাও চিন্তা করতে পারে না, অথচ একজন সংখ্যালঘু শ্রেণীয় ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ পায়। সরকারি চাকুরেদের ক্ষেত্রে অথবা বেসরকারি ব্যাপারেও সরকারের কাছে বিদেশ থেকে যেসব Scholarship-এর অফার আসে তাতে শর্তজুড়ে দেওয়া থাকে যে, এর অর্ধেক পাবে পার্বত্য জেলার উপজাতীয় লোক, বাকি অর্ধেকের অর্ধেক সংরক্ষিত থাকবে মহিলাদের জন্য এবং বাকি যেটা থাকবে সেটার জন্য একজন বাংলাদেশী পুরুষ আবেদন করতে পারবে। অর্থাৎ দেশের শতকরা ০.৫ জন লোক হয়েও একজন উপজাতীয় শতকরা ৫০ ভাগ পাবে। অর্থাৎ চাকরির অফার এলে একজন বাংলাদেশী মুসলমান মাত্র একটির ক্ষেত্রে আবেদনের সুযোগ পাবে এবং সেখানেও তাকে একজন হিন্দু পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এক্ষেত্রেও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে 'দেখা গেছে যে, শতকরা ৭০ ভাগ সম্ভাবনা যে হিন্দুটিই Scholarshipটি পাবে। অতি উদারতা এবং অতি সারল্য মুসলমানদের একটি স্বভাবগত দুর্বলতা। Sulaiman the magnifirst. তারই কৃপা প্রার্থী খ্রিস্টানদের রক্ষাকর্তা বানিয়েছিলেন। ভান্দসী রায়ের ষড়যন্ত্রে বাংলার সুলতান রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ তাঁর অতি সাহসী দক্ষ সেনাপতি ইসমাইল গাজীকে হত্যা করেন। সুতরাং আশ্চর্য নয় যে, নিজেকে উদার ও নিরপেক্ষ প্রমাণ করার জন্য অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংখ্যালঘু অফিসারটিকে সুবিধাদানের ক্ষেত্রে একটু অধিক নমনীয়তা প্রদর্শন করবেন।

মুসলমানদের বঞ্চিত করার বিনিময়ে নিজস্ব ঔদার্যের পরিচয় প্রদানের প্রচেষ্টা উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পরিলক্ষিত। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তাঁর আমলে একবার অনেক সিনিয়র অফিসারকে ডিঙিয়ে একজন জুনিয়র বৌদ্ধ অফিসারকে বিদেশে পোস্টিং দেবার জন্য প্রচলিত সমস্ত নিয়ম ও বিধি ভেঙ্গে সর্বোচ্চ সিলেকশন কমিটিকে (ক্যাবিনেট সেক্রেটারির সভাপতিত্বে পাঁচজন সিনিয়র সেক্রেটারিকে নিয়ে গঠিত কমিটি) দিয়ে প্রার্থীদের দু'বার Interview নিতে বাধ্য করেছিলেন। এরশাদের দুর্ভাগ্য, দু'বারই একই মুসলমান অফিসার প্রথম স্থান অধিকার করেন, তবে প্রথমবারে সম্পূর্ণরূপে অমনোনীত এরশাদের প্রার্থী দ্বিতীয়বারে তৃতীয় স্থান অধিকারী ব্যক্তিকেই মনোনীত করেন। ঘটনাটি এতই দৃষ্টিকটু ও অনৈতিক ছিল যে, ফাইলে স্বাক্ষর করার সময় একটু কৈফিয়তের সূরে তাঁর সেক্রেটারিকে বলেন, চট্টগ্রাম থেকে

একজন বৌদ্ধকে এই পোস্টিংটা দেওয়া উচিত, কি বলেন। ঘাড় বেঁকিয়ে মৃদু হাস্য করা ছাড়া সেক্রেটারির আর কিইবা করার ছিল?

আর একটি ঘটনাও এখানে উল্লেখ করা দরকার। ঘটনাটি এরশাদ-পরবর্তী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলে পরিচয়দানকারী সরকারের আমলের। সরকারী কার্যাপোলক্ষে আমরা একটি দাতা দেশের রাজধানীতে গিয়েছি। আমাদের রিসিভ করতে দূতাবাস থেকে যারা এলেন তাদের মধ্যে একজন তরুণ হিন্দু দ্বিতীয় সচিব ছিলেন। একটু বিস্মিত হবারই কথা। ছেলেটি ফরেন সার্ভিসের নন ট্রেড সার্ভিসের নন, এমনকি ইনফরমেশন সার্ভিসেরও লোক নয়। ফরেন সার্ভিসের বাইরে কেবল এসব সার্ভিসের সদস্যদের কখনও কখনও বাইরে পোস্টিং হবার সম্ভাবনা থাকে, তাও চাকরির একটি বিশেষ পর্যায়ে এবং বেশ কিছু অভিজ্ঞতা লাভের পর। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এই তরুণটি তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একজন প্রিয়ভাজন ব্যক্তি, এবং সেই সুবাদে এই অল্প বয়সে চাকরির সমস্ত নিয়ম-কানুন ভেঙ্গে তাকে এখানে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার Tenune শেষে তাকে সবচেয়ে একটি আকর্ষণীয় মন্ত্রণালয়ে ক্ষমতার কাছাকাছি স্থানে পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল। আমি আমার সমগ্র চাকরি জীবনে কোন তরুণ মুসলিম অফিসারকে এত সুবিধে ভোগ করতে দেখিনি। এ রকম ঘটনা সরকারের চাকরিতে অহরহ ঘটছে এবং বহু বঞ্চিত মুসলমান অফিসারের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই এসব তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে।

এই তো ২০ মে'র ইনকিলাবের এক খবরে দেখেছি, জনৈক দেবনাথ বনিক 'বিমানে' তার সিনিয়রদের ডিঙ্গিয়ে শুধু প্রমোশনই পায়নি, উক্ত প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে স্পর্শকাতর স্থানে পোস্টিং পেয়েছে। তবুও এদের খাই মেটে না। যখনই কোন মনের মত পোস্টিং মেলে না তখনই আমি Minority' কিনা বলে উদ্ভট অভিযোগ তোলেন।

এছাড়াও রাজনৈতিক, প্রচারসন্ত্রাস ও আরও বিভিন্নভাবে মুসলমানরা কম নির্যাতিত হচ্ছে না। বিশেষভাবে গত সরকারের আমলে নিজের মুসলমান পরিচয় দেয়া বা ইসলামী বিধি-বিধান মতে জীবন পরিচালনা করতে চাওয়া বা এ বিষয়ে কাউকে সাহায্য করতে যাওয়াও ছিল অপরাধ। যেমন ধরুন, মারকাজ-উল ইসলাম সম্পর্কীয় ঘটনাটি। এটি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। হাসপাতাল সেবা, এম্বুলেন্স সার্ভিস ছাড়াও তারা আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের মত ইসলামী শরীয়া মতে মৃতের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেন। সমস্তটাই সামাজিক সেবামূলক। কিন্তু যেহেতু নামের শেষে ইসলাম আছে অতএব এর এক ডাইরেক্টরকে গ্রেফতার করে দীঘদিন হয়রানি করানো হলো।

আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেই ভয়াবহ লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করুন। কচি কচি এতিম কিশোর (শুধু সরকারি হিসাব মতেই ৮ জন) নির্বোধ সরকারের আক্রোশের শিকার হয়ে প্রাণ দিল। কী ছিল তাদের অপরাধ? তারা কি নাঙ্গা তলোয়ার হাতে প্রকাশ্যে সংখ্যালঘু হত্যার আহ্বান জানিয়ে রাস্তায় মিছিল করে হিন্দু হত্যায় লিপ্ত হয়েছিল? তারা কি বাবরী মসজিদের মত পুলিশ-সেনাবাহিনীর প্রকাশ্য সহায়তায় কোন মন্দির ভাঙ্গতে গিয়েছিল? অথবা তারা কি প্রকাশ্যে কোন হিন্দু এমপির বাড়ি ঘেরাও করে তাকে তার ঘরবাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিল? না, এসব কিছুই তারা করতে যায়নি। তারা শুধুমাত্র চেয়েছিল নিজের বিশ্বাস মত জীবন পরিচালনার অধিকার এবং এ বিষয়ে সরকারি বা বেসরকারিভাবে হস্তক্ষেপের অবসান কামনা করেছিল। এই নিজস্ব বিশ্বাস মত জীবনযাপনের বা ধর্মবিধি পালনের স্বাধীনতা চাওয়ায় সরকার তাদের হত্যা করে। অথচ রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে এনজিও'র জনৈক হিন্দু নেত্রীর কার্যকলাপ দ্বারা মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করা হয়েছিল সে এনজিও'র অথবা সেই নেত্রীর কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করেনি। এর অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের ইসলাম সম্বন্ধে যা কিছু বলা যাবে এবং প্রয়োজনে মুসলমান হত্যাও করা যাবে কিন্তু যত অপরাধই করুক এমনকি প্রচলিত আইনেও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। তাহলে প্রকৃতপক্ষে নির্যাতিত হচ্ছে কে? সংখ্যালঘুরা, না সংখ্যাগিরষ্ঠরা?

একজন অশীতিপর বৃদ্ধ মিথ্যা খুনের মামলায় গ্রেফতার হয়ে লাঞ্ছিত হন শুধুমাত্র ইসলামী মতে জীবনযাপনের সবক দেন বলে। এ দেশে সংখ্যালঘুরা যদি নির্যাতিতই হতো তাহলে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের ভীতবিহ্বল হয়ে ঘরের কোণেই অবস্থান করতে দেখা যেত। কিন্তু তারা বরং কেউ কেউ বুক ফুলিয়ে সালামের বদলে নমস্কার বলবার উপদেশ দিচ্ছেন, কেউ মুসলমানের রক্ত কালী-মায়ের পদতলে অর্পণের হুকুম দিচ্ছেন, কেউ নামের আগে মুহম্মদ, আলহাজ্ব লাগাবার নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিব্যি বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘোরাফেরা করছেন। এখন পর্যন্ত তাদের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করেছেন বলে তো জানা নেই।

নির্যাতন কাকে বলে সেটা জানতে হলে ভারতের দিকে তাকান- প্রকাশ্য দিবালোকে একজন সম্মানীয় সাবেক এমপিকে পরিবারসদ্ধ কয়েক ঘণ্টা ধরে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। পুলিশের কাছে আকুল আবেদন করে কোন সাড়া মেলেনি। রাশি রাশি পোড়া লাশের স্তূপের বিপরীতে কোন এক বৌদ্ধভিক্ষুর হত্যাকাণ্ডকে এ দেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কাহিনী বলে একদিকে হাস্যকর অথচ পরিণামে অনিষ্টকর এক তথ্যসন্ত্রাস শুরু হয়েছে। জিজ্ঞাসা করি, হাজার হাজার উন্মুক্ত জনতা কি নাঙ্গা হাতে তার বাসস্থান আক্রমণ করেছিল। তার বাড়ি বা কোন

বৌদ্ধ মন্দির কি তারা পুড়িয়ে দিয়েছে? প্রকাশ্যে উন্মত্ত জনতা দ্বারা ঘেরাও হয়ে পুলিশের সাহায্য ঘন্টার পর ঘণ্টা চেয়েও পাননি? তাহলে কি করে বলা যাবে যে, এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন।

বাংলাদেশে বর্তমানে দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে। যদিও শুরু অনেক আগে তবে গত সরকারের আমলে এর তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, যদিও বর্তমানে কোন সরকারি গডফাদার নেই, তবে সন্ত্রাস চলছে। আশ্চর্য নয় যে, একটি সংখ্যালঘুও এর শিকার হবেন এবং এটাই আশ্চর্য যে, এই সন্ত্রাসের মহামারীর যুগে সংখ্যালঘু Victim-এর সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং বৌদ্ধ ভিক্ষু এই রকম কেন সন্ত্রাস অথবা একান্তই কোন ব্যক্তিগত কারণে নিহত হয়েছেন সেটা জানার জন্য আমাদের তদন্ত রিপোর্টের অপেক্ষা করতে হবে। আগেই একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে হৈচৈ করা সরকার এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চরিত্র হননের অপচেষ্টা মাত্র।

মুসলমানদের বঞ্চিত করে সংখ্যালঘুদের সুবিধাদানের ব্যবস্থা করার নীতি আওয়ামী লীগ বা তাদের পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠীর চিরকালীন রীতি। ১৯৫৬-তে সংখ্যালঘুদের অনুপাত ছিল ১৮.৪ অথচ চাকরিতে তাদের রিজার্ভেশন দেওয়া হয়েছিল ২৩ ভাগ। অর্থাৎ নিজ অনুপাতের চেয়ে শতকরা ৫ ভাগ বেশি কোটা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। বর্তমানে অবস্থা আরও ভয়াবহ। এখন সংখ্যালঘুদের সংখ্যা শতকরা ১২ হতে বড়জোর ১৫ শতাংশ, অথচ সরকারি চাকরিতে এদের অংশ ৩০ হতে ৩৫ শতাংশ। এর অর্থ হচ্ছে নিজ যথাযথ প্রাপ্য অপেক্ষা শতকরা ১৪ হতে ২০ শতাংশ বেশি তারা পাচ্ছেন এবং সেই পরিমাণে মুসলমানদের তারা বঞ্চিত করছেন। যে কোন সরকারি অফিসে টাঙ্গানো সারি সারি নেমপ্লেট অথবা সরকারী গেজেটে একবার নজর বুলালেই কথাটির সত্যতা বোঝা যাবে। এর সঙ্গে ভারত বা পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করলেই এর মর্মান্তিক দিকটি বোঝা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ অথচ সরকারি চাকরিতে তাদের স্থান শতকরা ০.৫-এরও নীচে। ভারতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে দেশ বিভাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন মুসলমান নেওয়া হয়নি; যেমন উত্তর প্রদেশের Provincial Arms Constubulary, বিহার Armed police এবং কেন্দ্রে CRP। তাহলে এখন সংখ্যালঘুর নির্যাতন ঘটছে কোথায়?

১৯৫৭-তে খাদ্যের চোরাচালানের কারণে দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা শুরু হয়। এই চোরাচালানে লিপ্ত ছিল কতিপয় হিন্দু ব্যবসায়ী। কিন্তু হিন্দু নেতাদের চাপে পড়ে আওয়ামী লীগ সরকার তৎকালে প্রচলিত Prevention of smugling (special powers) Ordinance 1957 (Ordinance No XVIII of 1957) আইনটি বাতিল করে দেয়। ফলে এইসব অসাধু ব্যবসায়ী

বিনা বিচারেই রক্ষা পায় (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Talukdar Maniruzzaman Group Interest and Political Change, page 55)

আমাদের দেশের যেসব ব্যক্তি বা মিডিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাসের সৃষ্টি করেন, তরুণদের কাছে নিজেদের একটু মর্যাদা বাড়াবার উদ্দেশ্যে তারা নিজেদেরকে আবার প্রগতিপন্থী বা বামপন্থী বলে চালাবার চেষ্টা করেন। আসলে বামপন্থী তত্ত্ব সম্বন্ধে যে তারা কেমন জ্ঞানের ভাণ্ডার সে বিতর্ক ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রেখে এটুকু বলা যেতে পারে যে, এরা মূলত সীমান্ত পারের বাবু মার্কসবাদীদের রিমোট কন্ট্রোলে চলেন; আর এই বাবুদের মার্কসবাদ যে ব্রাহ্মণবাদেরই নবতর রূপ সেটা কে না জানে! এই কারণেই এরা শ্রেণীতত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে সংখ্যালঘু আর আদিবাসী তত্ত্ব নিয়ে মাতামাতি করছেন। এই আনুগত্যের বদলে এদের অবশ্য কলাটা, মূলোটা প্রায়ই জোটে; কেউ তিন কোটি টাকা দিয়ে প্রেস স্থাপিত করেন, কেউ ৪৫ লাখ টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কেনেন, কেউ বা দৃশ্যমান কোন আয় ছাড়াই পাজেরো গাড়ি হাঁকান।

তবে হ্যাঁ, নির্বাচনের পর পরই দুই-চারজন সংখ্যালঘু যে নির্যাতিত হয়নি এমন নয়। তবে সেটা সংখ্যালঘু হিসেবে নয়, আওয়ামী লীগার হিসেবে। আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন যথা ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, সড়ক পরিবহন শ্রমিক লীগ, এগুলোর অধিকাংশ Top (শীর্ষস্থানীয়) নেতারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এমনকি, জেলা পর্যায়েও দেখা যায় দাদারাই মূল নেতা আর তাদের পাশে হাত কচলে মুসলমান কর্মীরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এখন আওয়ামী লীগের আমলে যে দমবন্ধ হওয়া সন্ত্রাসের রাজত্ব তৈরি হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া না হওয়াটাই অস্বাভাবিক বা অতিমানবিক।

মনে রাখতে হবে নিজেদের শারীরিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার জন্যই জনগণ বর্তমান সরকারকে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। আর চিন্তার স্বাধীনতা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে স্বজাতির চরিত্র হনন বা ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার মধ্যে যে অনেক তফাৎ আছে সেটি যে কোন বিদগ্ধ ব্যক্তিই বোঝেন। এমনকি মতলববাজ বুদ্ধিজীবীরাও যে বোঝেন না এমন নয়, কিন্তু তাদের তো শুধুই টাকার দরকার।

আশা করি সরকার বিষয়গুলো গভীরভাবে ভেবে দেখবেন।

উদ্ধৃতি ঃ ইনকিলাব, ২২ জুন ২০০২ ॥ আবু হাসান।

গুজরাটের ষড়যন্ত্রমূলক গোধরা হত্যাকাণ্ডের জট উন্মোচন

সত্য কখনো চেপে রাখা যায় না। দেরিতে হলেও একদিন না একদিন সত্য প্রকাশিত হবেই। ভারতের গুজরাট রাজ্যের গোধরা রেলস্টেশনে হিন্দু করসেবকবাহী কম্পার্টমেন্টে অগ্নিসংযোগের রহস্যও ফাঁস হয়েছে। ফরেনসিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কম্পার্টমেন্টের ভেতর থেকেই তরল দাহ্য পদার্থ ঢেলে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

আহমেদাবাদের ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি এই রিপোর্ট দিয়েছে। এ ল্যাবরেটরির সহকারী পরিচালক ডঃ এমএস দাহিয়া এই রিপোর্ট তৈরি করেছেন। ফরেনসিক রিপোর্ট তৈরি করার জন্য ঘটনাস্থলে অনুরূপ অগ্নিসংযোগের মহড়া দেয়া হয়। গত ৩ মে এক মহড়া চালিয়ে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়। অগ্নিকাণ্ডটি কিভাবে ঘটেছিল তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ঘটনাস্থলে ট্রেনের একটি বগিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। বিভিন্ন ধরনের বালতি ও জেরিক্যানের সাহায্যে বিভিন্ন দিক থেকে বগিটিতে তরল দাহ্য পদার্থে নিক্ষেপ করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে ১৪ ফুট দূরে তিন ফুট উঁচু একটি পাথরের স্তূপ রয়েছে। ফরেনসিক বিভাগের কর্মকর্তারা এই পাথরের স্তূপে দাঁড়িয়ে বগির জানালা লক্ষ্য করে পানি নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তাদের নিক্ষিপ্ত পানির মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বগির ভেতরে প্রবেশ করে। আর বাদবাকি পানি পতিত হয় বগির বাইরে। এই প্রক্রিয়ায় পানি নিক্ষেপ করে বিশেষজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, নিক্ষিপ্ত দাহ্য তরল পদার্থের বেশির ভাগ ছাড়িয়ে পড়েছে রেললাইন ও তার আশপাশে। তাই আগুনে বগির বাইরের অংশ ও তলদেশেরই ক্ষতি হওয়ার কথা। কিন্তু ২৭ ফেব্রুয়ারীর অগ্নিসংযোগে এস-৬ বগির বাইরের অংশ ও রেললাইনের কোন ক্ষতি হয়নি। জানালার নিচে আগুনের কোন চিহ্নই ছিল না। রিপোর্টে বলা হয় যে, বগিটির বাইরের অংশে অগ্নিসংযোগের ধরন বিবেচনায় নিয়ে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাইরে থেকে কোন তরল দাহ্য পদার্থ বগির ভেতরে নিক্ষেপ করা হয়নি। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞগণ বগির খোলা দরজা ও ল্যাট্রিন থেকেও পানি নিক্ষেপ করেন। তখন তারা দেখতে পান যে, সব পানি বগিটিতে ছড়িয়ে পড়ে না। এরপর তারা বগির প্যাসেজ দিয়ে ৬০ লিটার পানি ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে পান যে, পানি বগিটির সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ পরীক্ষা থেকে কর্মকর্তাগণ নিশ্চিত হন যে, প্যাসেজের ৭২ নম্বর আসনের কাছ থেকে প্রায় ৬০ লিটার তরল দাহ্য পদার্থ ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং তা সারা বগিতে ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই আগুনের সূত্রপাত ঘটে এবং তা দ্রুত কামরার ভেতর ছড়িয়ে পড়ে। আহমেদাবাদ ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির রিপোর্টে যে মতামত দেয়া হয়েছে তা পূর্ববর্তী ধারণাগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত।

গোধরা রেলস্টেশনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা সম্পর্কে এক মাস আগে চার্জশিট দাখিল করা হয়। ফরেনসিক রিপোর্টটি হচ্ছে এই চার্জশীটের একটি অংশ। এতদিন বলা হতো যে, গোধরা রেলস্টেশনে মুসলমানরা সবরমতি এক্সপ্রেস ট্রেনের এস-৬ কামরায় বালতি ও জেরিক্যান দিয়ে দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং এতে ৫৯ জন করসেবক জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। মুসলমানদের হামলাকারী হিসেবে চিহ্নিত করার আগে কেউ তলিয়ে দেখল না যে, জানালা বন্ধ ট্রেনের একটি কামরায় বাইরে থেকে দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করলেও ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত দাহ্য তরল পদার্থ ট্রেনের কামরার শরীর বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে আগুন ধরিয়ে দিলে ট্রেনের বাইরের অংশ ও রেললাইন পুড়ে যাবে। কিন্তু ভেতরের অংশ নয়। বন্ধ একটি কামরায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটতে পারে একমাত্র ভেতর থেকে। দাহ্য তরল পদার্থ সংযোগে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে থাকলে সেই দাহ্য তরল পদার্থের মজুদ ছিল ভেতরেই। এস-৬ কামরায় আরোহীদের প্রত্যেকেই ছিল হিন্দু করসেবক। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের রায় অনুযায়ী হামলাকারীরা ছিল ওই বিশেষ বগির আরোহী। সুতরাং এ কথা এখন দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে উচ্চ বর্ণের য়ে হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীরা পরিকল্পিতভাবে নিজেদের সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের লোকজনকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে কৌশলে ঘটনার দায় চাপিয়ে দিয়েছে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের ঘাড়ে। করসেবকরা নিম্নবর্ণের হিন্দু। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিন্তু তাদের পরিকল্পনায় যে একটি ক্রুটি ছিল এবং এই ক্রুটি যে পরবর্তীকালে বুমেরাং হবে, তা তারা ভাবতে পারেনি। এ জন্যই বোধহয় বলা হয় যে, Man proposes, butgod disposes. অর্থাৎ মানুষভাবে এক. হয় আরেক।

গোধরা রেলস্ট্রেশন করসেবক বোঝাই কামরায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা আগাগোড়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে ঘটেনি। এমন একটি ঘটনা ঘটানোর জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছিল। যে কোন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য একটি অজুহাতের প্রয়োজন হয়। সেদিন ষড়যন্ত্রকারীরা অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের ধ্বংসাবশেষের ওপর রামমন্দির নির্মাণে শিলান্যাস শেসে ফেরার পথে একটি মন মত অজুহাত খুঁজে পাবার জন্য জায়গায় জায়গায় চেষ্টা করেছে। প্রথমে সবরমতি এক্সপ্রেস ট্রেনটি জামে গোধরা রেলস্টেশনে । এই স্টেশনে ট্রেন থামলে ভিতরের এজেন্টদের প্ররোচণায় করসেবকরা সকালের নাশতার জন্য একটি স্টলে ঢোকে। নাশতা সেরে পয়সা না দিয়ে তারা ট্রেনে ফিরে আসার জন্য উঠে দাঁড়ায়। এ সময় এজেন্টদের

প্ররোচণাতেই স্টল মালিকের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। তারা পয়সা চাওয়ায় স্টলটি ভেঙ্গে দেয়। এরপর তারা সদর্পে ট্রেনে ফিরে আসে। সকাল ৭টা সাড়ে ৭টার দিকে ট্রেনটি গোধরা স্টেশনে এসে পৌঁছায়। তিনটি রিজার্ভ কামরা থেকে করসেবকরা নেমে গিয়ে স্টেশনের একটি স্টলে চা-নাশতা খেতে বসে। স্টলের মালিক ছিলেন এক বুড়ো দাড়িওয়ালা মুসলমান। এজেন্টদের প্ররোচণায় করসেবকরা তর্কাতর্কি শুরু করে এবং তাকে পেটাতে থাকে। তারা তার দাড়ি নিয়েও টানাটানি করতে থাকে। তখন করসেবকরা এজেন্টদের পরিকল্পনামাফিক স্লোগান দিচ্ছিল, মন্দির কা নির্মাণ কারো, বাবর কি আওলাদ কো বাহার কারো। অর্থাৎ 'মন্দির নির্মাণ কর, বাদশাহ বাবরের বংশধর তথা মুসলমানদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দাও'। এসব চিৎকার শুনে বুড়োর ১৬ বছরের মেয়ে এগিয়ে এসে দেখেন তার আব্বা আক্রান্ত। সে তার আব্বাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তখন করসেবকরা মেয়েটিকে তুলে নিয়ে এস-৬ কামরায় উঠে জানালা দরজা বন্ধ করে দেয়। ট্রেন গোধরা স্টেশন থেকে রওনা দেয়। এই দৃশ্য দেখে দু'জন স্টল ভেন্ডার ট্রেনে উঠে পড়ে এবং গোধরা স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার দূরে ট্রেনটিকে থামায়। এই দু'জন স্টল ভেন্ডার করসেবকদের কাছে গিয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানান। এতে করসেবকরা তাদের প্রতি মারমুখী হয়ে ওঠে। এই ঘটনা দেখে আশপাশের লোকজন ভিড় জমাতে থাকেন। একটি ষোড়শী তরুণীকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এ কথা শুনতে পেয়ে লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ট্রেন লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। এস-৬ কামরার পাশে আরো দুটি রিজার্ভ কামরায়ও করসেবক ছিল। এসব করসেবক তখন বাঁশের লাঠি নিয়ে সমবেত লোকজনকে পেটাতে শুরু করে। ঘটনার এ বর্ণনা দিয়েছেন গুজরাট সমাচার নামে একটি দৈনিকের দু'জন সাংবাদিক। এরা হলেন অনীল সোনি ও নীলাম সোনি। বৈদিক ব্রাহ্মণ শাসিত মনু সংহিতার সমাজের স্বার্থান্বেষী মুসলিমবিদ্বেষীরা ছাড়া কেউ বলছেন না যে, গোধরা রেলস্টেশনে সবরমতি এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের জন্য মুসলমানরা দায়ী। সামান্য বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পেরেছেন যে, মুসলিম উৎখাত কামনায় এটা একটা সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত। মুসলিম উৎখাতকারী সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএস-এর রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির আমলে বিজেপি শাসনাধীন রাজ্য গুজরাটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানরা সরকারে এবং পুলিশে-প্রশাসনে মুসলমান না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ভবিষ্যৎ ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটি জঙ্গি সংগঠনের এতগুলো লোককে পুড়িয়ে মেরে ফেলবে-এটা যুক্তি বোধসম্পন্ন কোন বিবেকবান ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারের না। গোধরায় সেদিন যে ধরনের ঘটনা ঘটেছিল এমন ঘটনা ভারতে প্রতি মুহূর্তেই ঘটছে। এই নিষ্ঠুর বাস্তবতার

ভেতরই ভারতীয় মুসলমানরা বসবাস করছেন। সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের অভাব ঘটলে তারা ভারতে থাকতে পারতেন না। হত্য না করেই বা উপায় কি? যা প্রতিকার করা যায় না তা সহ্য করে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু গোধরা হত্যাকাণ্ডে মুসলমানদের এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে, তারা শুধু অসহিষ্ণুই নয় বরং মুসলিমবিদ্বেষী ও মুসলিম উৎখাতকারী হিন্দু চরমপন্থী দলগুলোর চেয়েও যেন হিংস্র ও জঙ্গি। এটা কীভাবে সম্ভব? তাই প্রথম থেকেই সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। খোদ ভারতীয়রাই সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

প্রখ্যাত ভারতীয় লেখিকা অরুন্ধতী রায় তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, We still don't know who exactly was responsible for the camage in Godhra. অর্থা আমরা এখনো জানি না ঠিক কারা গোধরা হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। নয়াদিল্লীস্থ ব্রিটিশ দূতাবাসও অনুরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেছে। গোধরা হত্যাকাণ্ডে একজন ব্রিটিশ নাগরিক নিহত হন এবং নিখোঁজ হন তার অন্য দুই আত্মীয়। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ব্রিটিশ নাগরিকদের ভাগ্য সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য দিল্লীস্থ দূতাবাসকে নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী ব্রিটিশ দূতাবাসের তিনজন কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে গিয়ে আদ্যোপান্ত সব খোঁজ-খবর নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। এ রিপোর্টে তারা বলেন যে, গোধরা হত্যাকাণ্ড পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে এবং গোধরার ঘটনাটি না ঘটলেও অন্য কোন অজুহাত সৃষ্টি করে মুসলমানদের ওপর হামলা চালানো হতো।

ব্রিটিশ দূতাবাসের রিপোর্ট কত সত্য? করসেবক বোঝাই সবরমতি ট্রেনের পর পর দু'টি রেলস্টেশনে থামা, পরিকল্পনামাফিক এজেন্টদের প্ররোচণায় দু'দুটি স্টলে চা-নাশতা করে করসেবকদের বিল পরিশোধে অস্বীকৃতি, স্টল মালিকদের গালাগালি ও তাদের মারধর করা, স্টল ভেঙ্গে দেয়া, বুড়ো মানুষের দাঁড়ি ধরে টানাটানি এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ মানুষটির ষোড়শী কন্যাকে জোর করে ট্রেনে উঠিয়ে নেয়া ও উত্তেজনাপূর্ণ স্লোগান দেয়া প্রভৃতি ঘটনা এ কথাই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এজেন্ট প্রভোকেটরদের পরিকল্পনামাফিক ট্রেনের আরোহী করসেবকরা পায়ে পাড়া দিয়ে আগ বাড়িয়ে গণ্ডগোল বাধানোর জন্য একের পর এক চেষ্টা করে গেছে। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল মুসলিমবিদ্বেষী কোন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। পরিকল্পনা ছাড়া এমন করার কথা নয়। পৃথিবীর কোন বিবেকবান মানুষই বলবেন না যে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলে মানুষ এমন আচরণ করতে পারে। গোধরা হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহও প্রমাণ করে যে, যা কিছুই ঘটেছে তার প্রত্যেকটির পেছনেই ছিল পূর্বপ্রস্তুতি ও নিখুঁত পরিকল্পনা। করসেবক বোঝাই ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে না ঘটতেই মুসলমানদের বাড়িঘরে আগুন লাগানো শুরু হয়। বিদ্যুতের খুঁটি ও হুইসেল বাজিয়ে মোটরসাইকেলে

চড়ে সংঘ পরিবারের মুসলিম উৎকাতকামী হাজার হাজার হিন্দু নিরীহ, নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম নিধনযজ্ঞকালে ক্যানভর্তি কেরোসিন ও পেট্রল সরবরাহ করা হয়। শত শত ট্রাক এই সরবরাহে নিয়োজিত ছিল। পরিকল্পনা ও পূর্বপ্রস্তুতি না থাকলে তৎক্ষণাৎ থরে থরে সাজানো ক্যানভর্তি ট্রাকগুলো এলো কীভাবে? ঘটনার দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, মুসলিম গণহত্যায় উন্মুখ দাঙ্গাকারীরা আগে থেকেই জানত যে, মুসলিম নিধন কালে দাঙ্গা হবে এবং যখন তখন তাতে তাদের সাড়া দিতে হবে। হুইসেল ব্যবহার সেটাই প্রমাণ করে। হুইসেল বাজিয়ে হিন্দু জনতাকে জানান দেয়া হয় যে, দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে, যে যেখানে আছো ছুটে এসো।

হিন্দু হচ্ছে সেই জাতি যারা নিজেদের সম্প্রদায়ের নীচু জাতকেও মানুষ বলে গণ্য করে না। নিজেদের ধর্মের অনুসারীদের নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতি যাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই পর্যায়ে, সেখানে ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব কী হতে পারে তা কল্পনা করতে কষ্ট হয় না। হিন্দুরা একটি কুকুরকে যতটুকু মর্যাদা দেয় একজন মুসলমানকে ততটুকু মর্যাদাও দেয় না। কোন কুকুর হিন্দুর ঘরে প্রবেশ করলে অশুচি হয় না, কিন্তু মুসলমান প্রবেশ করলে রক্ষা নেই। তাদের ঘর-দোর, খাবার-দাবার সব অশুচি হয়ে যায়। এটা কোন গল্প নয়, নির্জলা সত্য। গুজরাটে দাঙ্গাকালে হিন্দু দাঙ্গাকারীরা স্লোগান দিয়েছে, মিয়া নে মারো, মিয়া নে কাটো। অর্থাৎ মুসলমানদের মারো, মুসমানদের কাটো। এই হচ্ছে, মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের প্রকৃত মনোভাব। তারা মুসলমানদের রক্ত পান করতে চায়। এ জন্য তারা সুযোগ খোঁজে, তাই মুসলমানরা খুবই হিসাব করে পা ফেলে। মুসলমানদের সাবধানে পা ফেলতে দেখে হিন্দুদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আর তখনি তারা গোধরা হত্যাকাণ্ডের মত গ্রাউণ্ড সৃষ্টি করে মুসলিম নিধনে নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের হামলা ছিল এতই নিষ্ঠুর ও নৃশংস যে, বিবেকবান কোন কোন হিন্দুও চোখের পানি সংবরণ করতে পারেননি। অরুন্ধতী রায়ের এক বন্ধু বরোদাত থেকে তাকে টেলিফোন করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন যে, তার বন্ধু সাইদাকে দাঙ্গাবাজরা ধরে নিয়ে তার পেট চিরে ফেলে এবং পেটের মধ্যে জ্বলন্ত কম্বল ঢুকিয়ে দেয়। মৃত্যুর পর সাইদার কপাল কেটে তাতে লেখা হয় 'ওম' (হিন্দু ধর্মীয় মন্ত্র)। হিন্দু দাঙ্গাবাজরা রাতের অন্ধকারে আহমেদাবাদে আধুনিক উর্দু কবিতার জনক ওয়ালী গুজরাটির কবর ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। উপমহাদেশের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ ফয়েজ আলী খানের কবরও ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। দাঙ্গাবাজরা কংগ্রেসের সাবেক এমপি ইকবাল আহসান জাফরীর বাড়ি ঘেরাও করে। বাড়ি আক্রান্ত হলে ইকবাল জাফরী পুলিশের আইজি, পুলিশ কমিশনার, চীফ সেক্রেটারী, এডিশনাল

চীফ সেক্রেটারী (স্বরাষ্ট্র) প্রত্যেককেই টেলিফোন করেন। কিন্তু কেউ তার টেলিফোনে সাড়া দেয়নি। তার বাড়ির আশপাশে পুলিশের ভ্রাম্যমাণ টিম ছিল। তারাও এগিয়ে আসেনি। দাঙ্গাবাজরা ইকবাল জাফরীর বাড়িতে প্রবেশ করে তার মেয়েদের উলঙ্গ করে তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারে এবং ইকবাল জাফরীর মাথা কেটে ফেলে তার শরীর টুকরো টুকরো করে। দাঙ্গাবাজদের ভয়ে গুজরাট রাজ্যের প্রধান বিচারপতি কাদরি তার সরকারি বাসভবন ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। রাজ্য পুলিশ তার কোন নিরাপত্তাই দিতে পারেনি। আহমেদাবাদের কেন্দ্রীয় আয়কর ট্রাইব্যুনালের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব বখ্‌তী পালিয়ে যান। পরে তাকে নিরাপত্তার জন্য কলিকাতায় বদলি করা হয়। দাঙ্গাকালে সকল মুসলিম অফিসারকে আইন-শৃঙ্খলা শাখা ও তদন্ত কাজের দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অফিসগুলোতে ৩ হাজার ৫০ টাকা করে রিভলবার বিক্রি করা হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নামে একটি প্যাম্ফলেট প্রচার করা হয়। এ প্যাম্ফলেট হিন্দু বিবেকের কাছে আবেদন জানিয়ে বলা হয়, আপনারা দেশের খুব গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল নাগরিক। কিন্তু আপনি ও আপনার পরিবার বিপদের মুখে আছেন এবং আপনার জীবনের ওপর হুমকি আছে। আমি সে বিষয়েই আপনাদেরকে সতর্ক করছি। আপনারা মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বয়কট করুন। দু'পৃষ্ঠার এ প্যাম্ফলেট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের তাত্ত্বিক নেতা গুরু গোলওয়ালকরের সাক্ষাৎ শিষ্য বর্তমান উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদভানী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যারা মুসলিম উৎখাত কামনায় দীক্ষা নিয়েছেন তাদের পক্ষে তো মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে সহযোগিতা করার কথাও নয়।

গুজরাটের মুসলমানরা নিজেদের দেশেই শরণার্থী। তাদের জন্য শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। মুসলিম সংগঠনগুলোই মূলত এসব শিবির পরিচালনা করছেন। সরকার অথবা সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় শরণার্থীদের ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী নয়। বাইরের পৃথিবও জানে না গুজরাটে কি ঘটছে। ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলো নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। কোন সভ্য দেশে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর এমন জঘন্য নির্যাতন চালানোর নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা খ্রিস্টানদের তরফে বসনিয়া, চেচনিয়া ও কসোভোয় মুসলিম নির্যাতনের কাহিনী জানি। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে গুজরাটে মুসলিম নিধনযজ্ঞের ব্যাপকতা ও হিংস্রতা সেসব উপাখ্যানকেও ছাড়িয়ে গেছে। শরণার্থী শিবিরগুলো যারা পরিদর্শনে গিয়েছেন তাদের চোখে ধরা পড়েছে গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার বর্বর বীভৎস রূপ। একজন সাংবাদিক ২৭ মার্চ কুতুব-ই আলম দরগাহ ত্রাণ

শিবিরে গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করেন। ২৩ বছরের শবনম হচ্ছে তাদের একজন। শবনম ১ মার্চের বিকেল বেলার দুঃস্বপ্নময় ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, ত্রিশূল ও উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে একদল উন্মত্ত জনতা আমাদের ঘেরাও করে ফেলে। আমরা ছিলাম ৫০ জনের মত। আর তারা ছিল কয়েক হাজার। আমরা পালাতে চাইলাম। কিন্তু পুলিশ আমাদের পালানোর রাস্তা বন্ধ করে দেয়। পুলিশ আমাদের উন্মত্ত জনতার দিকে ধাওয়া করতে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সায়রা বানুও এই ত্রাণ শিবিরের একজন বাসিন্দা। তার বাড়ি নরোদা পাতিয়ার হোসেনপুর গ্রামে। তিন সন্তান নিয়ে তিনি শিবিরে উঠেছেন। তথ্যানুসন্ধানী দলের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানালেন, আমি মেয়েদের আর্তনাদ শুনতে পেলাম। ২৫ জন লোক একটি উলঙ্গ মেয়েকে ধাওয়া করছে। সায়রা বানু আরো জানান, পুলিশের গুলিতে আমি আমার স্বামীকে মারা যেতে দেখলাম। আরো দেখলাম মিষ্টি দোকানের মালিক দাঙ্গাকারীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করছে। মুসলমানদের বাড়িঘর, দোকানপাট, হোটেল, কাপড়ের কল, বাস, প্রাইভেট মোটরগাড়ি, বহু মসজিদ, দরগাহ, কোন কিছুই রক্ষা পায়নি। পুড়ে যাওয়া ঘরের দেয়ালে লেখা ছিল, ইয়ে অন্দর কিয়া বাত হ্যায়, পুলিশ হামারা সাথ হ্যায়। অর্থাৎ ভেতরের কথা হলো, পুলিশ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আরেক জায়গায় লেখা ছিল, 'মুসলমানদের কিভাবে পুড়িয়ে মারতে হয় তা আমাদের কাছ থেকে শিখে নাও।'

ভারতের তথাকথিত ধর্মরিপেক্ষতাবাদীরা উঠতে-বসতে দ্বিজাতিতত্ত্বের সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান নাকি একটি সাম্প্রদায়িক দেশ। ঠিক আছে মেনে নিলাম তাদের সমালোচনা। কিন্তু তারা কি? তাদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের গুজরাটে সংখ্যালঘু মুসলমানদের যেভাবে হাজারে হাজারে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, কথিত সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানে কি আজ পর্যন্ত একজন সংখ্যালঘু হিন্দুকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে আমরা কোন দেশকে আদর্শবাদী বলব- পাকিস্তানকে, না ভারতকে। আজ এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিটি মুসলিম দেশে অমুসলিমরা নিরাপদে বসবাস করছে। কারণ মুসলমানরা বিশ্বজনীন আদর্শে বিশ্বাস করে। গোঁড়ামী, সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঠাঁই ইসলামে নেই। এ জন্যই ইসলাম নবীন ধর্ম হয়েও বিশ্বে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যদিকে অমুসলিমরা হচ্ছে সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক। অমুসলিম দেশগুলোর দিকে তাকালেই আমরা এ কথা বুঝতে পারি। এ কারণে মুসলমানরা দেশে দেশে অমুসলিম শক্তির সঙ্গে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়াই করছে। দ্বিজাতিতত্ত্ব হচ্ছে উপমহাদেশে মুসলমানদের নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

নিয়ে বাঁচার একটি ঐতিহাসিক সনদ। বারবার এ কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা এই সত্যকে আবার প্রমাণ করল। যদি কারো সন্দেহ থাকে তাহলে ভবিষ্যতে সে আরো প্রমাণ দেখতে পাবে। মুসলমানদের যারা জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে আমরা তাদের কখনো ক্ষমা করব না। শুধু আমরা কেন, ইতিহাসও তাদের ক্ষমা করবে না। কিন্তু ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলো বিজেপি সরকারকে ক্ষমা করে দিয়েছে। সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও ভারতের কথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের পদত্যাগ দাবি করেনি। তারা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগ দাবী করে মুসলমানদের ধোঁকা দিতে চেয়েছে। বিজেপি জানত যে, এ দাবি না মানলে কিছুই হবে না। সত্যিই বিজেপির কিছু হয়নি। নরেন্দ্র মোদি তার পদে বহাল তবিয়তে আছেন। মোদি ও বাজপেয়ী প্রায়ই একত্রিত হন এবং দু'জনে প্রাণ খুলে হাসেন। তাদেরই হাসার কথা। মুখের হাসি আরো প্রসারিত করার জন্য পারমাণবিক বিজ্ঞানী ডঃ এপিজে আব্দুল কালামকে প্রেসিডেন্ট বানানো হচ্ছে। বিশ্বকে বোঝানো হচ্ছে যে, ভারতে কোন মুসলিম নির্যাতন নেই। মুসলিম নির্যাতন থাকলে কি এই সম্প্রদায়ের লোক দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারে?

ওদিকে গুজরাটে মুসলমানদের জান-মাল এবং মসজিদ-দরগাহর ওপর হামলা অব্যাহত রয়েছে। গুজরাটে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুসলিম উৎখাতকামী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গত ৩ জুলাই ২০০২ তারিখ বুধবার আহমেদাবাদে একশ' বছরের পুরনো মাদানী মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে যারা বেঁচে আছেন তারা প্রাণের ভয়ে আশ্রয় শিবিরগুলো ছাড়তে চাইছেন না। গত ৪ জুলাই ২০০২ তারিখ বৃহস্পতিবার গুজরাটের বরদা জেলায় আশ্রয় শিবির থেকে একজন মুসলমান তার সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তার সন্তানসহ মনুসংহিতার সমাজের মুসলিম উৎখাতকামী অমানুষদের হাতে নিহত হন। আগামী ১২ জুলাই ২০০2 তারিখ শুক্রবার জগন্নাথের রথযাত্রা মুসলিম বিদ্বেষ ও মুসলিম উৎখাত কামনায় দীক্ষিত মনুসংহিতার সমাজের সঙ্ঘ পরিবারের নরপিশাচরা ঐদিন আরও একবার ব্যাপকভাবে মুসলিম নিধনযজ্ঞে নামবে বলে মুসলমানরা শঙ্কিত, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। আসলে সমস্যাটা হলো এই যে, সামগ্রিকভাবে মনুসংহিতার গোটা সমাজটাই ইতিহাস বিকৃতি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘ পরিবারের বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিব সেনা, দুর্গা বাহিনী, করসেবক ইত্যাকার মুসলিমবিদ্বেষী সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে পুরোপুরিই সহাবস্থানবিরোধী মানবিকতা নিয়ে আছে। আর সেই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের

৬—

রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি এখন কেন্দ্রে এবং গুজরাট রাজ্যে ক্ষমতাসীন। এদের দাবি তামাম উপমহাদেশের মুসলমানদের হয় হিন্দু হয়ে শূদ্রের পরে ঠাঁই নিতে হবে কিংবা নিহত অথবা উৎখাত হতে হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানী যার সাক্ষাৎ শিষ্য, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সেই সাংগঠনিক ও তাত্ত্বিক নেতা গুরু গোলওয়ালকরের 'উই অব আওয়ার নেশন হুড ডিফাইনড' গ্রন্থেই এসব কথা আছে। এরই প্রতিফলন হিসেবে নানান অজুহাতে ভারতীয় মুসলমানদের ওপর হরেক রকমের নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। এক জাতিতত্ত্বের ধারণায় তাদের এসব কর্মসূচি কেবল ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে তামাম উপমহাদেশেই বিপর্যয় নেমে আসবে। *উদ্ধৃতি ঃ সাহাদত হোসেন খান। দৈনিক ইনকিলাব, ১৩ জুলাই ২০০২ ॥*

৪ হাজার করসেবকের ক্যাপ্টেন শিব প্রসাদের অপূর্ব কাহিনী
যে হাত একদিন বাবরী মসজিদ ভেঙ্গেছিল আজ সে হাতই ওই মসজিদ গড়তে চায়

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর। এদিন ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংসের জন্য আগত হাজার হাজার করসেবকের মধ্যে অল্প কয়েকজন মসজিদটির মিনারে ওঠে। এদের কয়েকজন ছিল শিবসেনার সদস্য। অযোধ্যা ফয়যাবাদে অবস্থিত। এই ফয়যাবাদের অধিবাসী শিব প্রসাদ হচ্ছেন বজরং দলের ক্যাপ্টেন। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের জন্য ৪ হাজার লোক সরবরাহ করেন। মসজিদের বিরাটাকৃতির মিনার ভেঙ্গে নামানোর দৃশ্য দেখে ক্যাপ্টেন শিব প্রসাদ আনন্দে চিৎকার করে বলছিলেন, রাম! রাম! এ ঘটনাটি সাত বছর আগের।

এর পরের ঘটনা ১৯৯৯ সালের ৬ ডিসেম্বরের। একই শিব প্রসাদ সাত বছর আগে তার কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন। তিনি রোজা (নফল) রেখেছিলেন এবং কান্নাভেজা কণ্ঠে নামাযের পর মোনাজাতে ক্ষমা চাচ্ছিলেন। জী হ্যাঁ! শিব প্রসাদ ইসলাম কবুল করেছেন। তিনি তার নাম বদলিয়ে রেখেছেন মোহাম্মদ মোস্তফা। তিনি কিভাবে ইসলাম কবুল করলেন সেটা জানতে পারলে যে কেউ অভিভূত হয়ে পড়বে। শিব প্রসাদের এই মন পরিবর্তনের কাহিনী সউদী আরবের 'আরব নিউজ' পত্রিকায় ১৯৯৯ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। শিব প্রসাদের পিতা ত্রিকাল রামনাথান সংঘ পরিবারের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন। তার গোটা পরিবার বাবরী মসজিদ ধ্বংসে সক্রিয় ছিল।

মসজিদটি ধ্বংসের পরপরই শিব প্রসা'দের মনে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। তার মনে কোন শান্তি ছিল না। তিনি অনুভব করলেন, তিনি একটি বড় পাপের কাজ করেছেন। তিনি ১৯৯৭ সালে চাকরি লাভের জন্য আরব আমীরাতের শারজাহ-এ যান। তিনি চাকরি পেলেন। কিন্তু চাকরির মধ্যেও তার মনের অশান্তি গেল না।

১৯৯৮ সালের ৪ ডিসেম্বর। এদিন ছিল শুক্রবার। শিব প্রসাদ রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। এ সময় পথের ধারের একটি মসজিদ থেকে তিনি হিন্দি ভাষায় জুমার খুতবা শুনতে পেলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে খুতবা শুনলেন। তার কাছে কথাগুলো একটু অন্যরকম মনে হল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তিনি পুরা খুতবা শুনলেন। আল্লার বাণী তার অশান্ত মনে বিপ্লবের সৃষ্টি করল। এরপর থেকে তিনি এ ধরনের খুতবা শোনা অব্যাহত রাখলেন। বেশকিছু দিন পরে তার মনের বিপ্লব পরিপূর্ণতা লাভ করল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হলেন।

তার ইসলাম গ্রহণের খবরে পরিবারের সদস্যরা তাকে বিতাড়িত করে। কেননা, পরিবারের আর সকলেই ছিল আরএসএস-এর কট্টরপন্থী কর্মী। শিব প্রসাদ আল্লাহর কাছে তার পরিবারের সদস্যদের সঠিক পথ লাভের জন্য দোয়া করতে থাকেন। তিনি বলেন, যারা মসজিদ ধ্বংসের কাজে নেতৃত্ব দেন তাদের মধ্যে ছিলেন অশোক সিংঘল ও লালকৃষ্ণ আদভানী। বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার দিন রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএ) ধ্বংস করার কাজে বিজেপি, বজরং দল এবং আরএসএসকে তাদের নীরব সম্মতি প্রদান করে। উভয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মসজিদ ধ্বংসের কাজে বড় ধরনের সহায়তা করে।

তিনি সেদিনের কথা স্মরণ করে বলেন, সেদিন অশোক সিংঘল সামরিক বাহিনীর ইউনিফরম পরা ছিলেন। তিনি সে অবস্থায় করসেবকদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তিনি আরো স্মরণ করেন, মসজিদ ধ্বংসের পরপরই তারা ফয়যাবাদের মুসলমান অধ্যুসিত এলাকায় প্রবেশ করেন এবং চিৎকার করে বলেন, 'জয় শ্রীরাম'।

বর্তমানে শিব প্রসাদ আরএসএস, বিজেপি ও বজরং দলের পক্ষ থেকে অনবরত হুমকি পাচ্ছেন। তিনি ভারতে ফিরলে তাকে হত্যা করা হবে বলে সংঘ পরিবার তাকে হুমকি দিয়েছে। কিন্তু মোহাম্মদ মোস্তফা (শিব প্রসাদ) দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, তিনি কখনোই ইসলাম ত্যাগ করবেন না। কেননা, ইসলাম একমাত্র সঠিক পথ। ইসলামের পথে মৃত্যুবরণ করতেও তিনি প্রস্তুত। তিনি এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের ১৭টি সূরা শিখেছেন। এখন অবশিষ্ট সুরাগুলোও তিনি শিখতে চান। একজন খাঁটি মুসলমান হয়ে তিনি ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ

করতে চান। এটাই তার জীবনের লক্ষ্য। তিনি চান অজ্ঞ লোকদের অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরিয়ে আনতে। আল্লাহর ইচ্ছা হলে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে এবং যে হাত দুটি একদিন বাবরী মসজিদ ভেঙ্গেছিল সে দু'টি হাতই একদিন আবার সেই মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত হবে। *সূত্র ঃ ইন্টারনেট।*

গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা ঃ আমাদের বিবেক

মানব সমাজের মূলভিত্তি ছিল পারস্পরিক নিরাপত্তা ও সহমর্মিতা। বৈরী প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অন্যান্য বৈরী সৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সমাজের প্রয়োজন ছিল। তাই মানুষের সম্মিলন হাজার হাজার বছর ধরে ব্যাপ্ত হতে হতে আজকের পর্যায়ে এসেছে। কিন্তু গত শতকে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা মানব সমাজেই এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে নিরাপত্তার বোধ। জার্মানীতে ইহুদীদের নির্মূল অভিযান, জাপানে মার্কিন সেনাবাহিনীর পারমাণবিক হত্যাকাণ্ড, ভিয়েতনামে আমেরিকানদের দীর্ঘমেয়াদি ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যা, ফিলিস্তিনে এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় মুসলিম গণহত্যার পর মানব সমাজের সম্প্রসারণ এ শতকের প্রথম নির্মম গণহত্যা গুজরাটের মুসলিম হত্যাকাণ্ড। গুজরাটে চারদিকে ঘেরাও করে দিনের পর দিন ধরে পাইকারী হারে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কাউকেই রেহাই দেয়া হচ্ছে না। অধিকাংশ মুসলমানকে ঘরে বন্ধ করে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। বিদেশী গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ থেকে আমরা এসব জানতে পারছি। বিবিসি ও সিএনএন প্রথম গুজরাটের মুসলিম গণহত্যার স্বরূপ তুলে ধরে। এজন্য সিএনএনকে মূল্যও দিতে হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও খবর প্রকাশিত হচ্ছে।

যাই হোক, গুজরাটের মৌলবাদী জংগী হিন্দুদের হাতে মুসলিম গণহত্যা এখন প্রকাশ্য ব্যাপার। প্রতিদিনই মুসলমানদের খুন করা হচ্ছে। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং এ ধরনের বীভৎস ঘটনা ঘটেই চলেছে প্রতিদিন, প্রায় দু'মাস ধরে। তার চেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হল হত্যাকাণ্ডে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে রাজ্যসরকার। তাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতের বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর কূটনীতিকরাই বলছেন, গুজরাটের গণহত্যা পূর্বপরিকল্পিত, রাজ্যসরকারের সমর্থন ও মদদে তা পরিচালিত হচ্ছে। ভারতে অবস্থানরত বৃটিশ কর্মকর্তাদের বৃটিশ পররাষ্ট্র দফতরে পাঠানো রিপোর্টে পরিষ্কার ভাষায় অভিযোগটি বর্ণিত হয়েছে যে, রাজ্যসরকারই মুসলিম হত্যাকাণ্ডের মদদদাতা। তাদের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে বিবিসি তা প্রচার করেছে।

গণহত্যা শুরু হওয়ার বেশ কিছুদিন পর বাজপেয়ী গুজরাট সফর করেন। তখন তিনি মুসলমানদের জন্য কিছু সান্ত্বনা বাক্য বর্ষণ করেছিলেন অন্তত। কিন্তু গণহত্যা বন্ধে কোন পদক্ষেপ নেননি। এখন তার বক্তব্য আরও খোলামেলা হয়ে উঠেছে। অটল বিহারী বাজপেয়ী দাঙ্গা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মুসলমানরা শান্তিতে বাস করতে চায় না, তারা অন্যের জন্য ভীতিকর ও হুমকিস্বরূপ (বদরুদ্দীন উমর, যুগান্তর, ২৪-০৪-২০০২)। তার এ ধরনের বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হত্যাকাণ্ডের সমর্থনেরই নামান্তর।

গুজরাটের দাঙ্গার কারণে সকল বিরোধী দল এবং শরীক দলগুলোর পক্ষ থেকেই যখন দাবি উঠল রাজ্যসরকার প্রধান নরেন্দ্র মোদীকে বরখাস্ত করা হোক, তখন বিজেপি তাকে সমর্থন করে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে। আন্তর্জাতিক মহলের দায়সারা সমালোচনাও খুব সহজে এড়িয়ে যেতে পারছে দলটি।

বাজপেয়ী গুজরাটের মুসলমানদের পাইকারী হত্যার ঘটনার সমর্থনে যুক্তি দিয়ে বলছেন যে, মনে রাখতে হবে কারা প্রথম ট্রেনে অগ্নিসংযোগ করেছিল। আমরা জানি ভারতের সরকার যদিও প্রচার করেছে যে, মুসলমানরাই গোধরা স্টেশনে সবরমতি এক্সপ্রেসে আগুন ধরিয়ে ৫৮ জন হিন্দুকে হত্যা করেছে। কিন্তু পরে ভারতের প্রচার মাধ্যমেই ভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়, যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক গুজরাটে মুসলিম ঘটনা ঘটিয়েছে হিংস্র মৌলবাদী হিন্দুরাই। এখন বৃটিশ কর্মকর্তাদের রিপোর্ট এবং প্যারিসভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্টের তথ্যও সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। ভারতের এই সাম্প্রদায়িক চেহারা নতুন নয়। বৃটিশদের কাছ থেকে উপমহাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মুহূর্তেই ভারত একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেয়। ভারতীয় লেখক বি এফ কারাকা তার বিট্রেইয়াল ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন কিভাবে নেহরু মৌলবাদী হিন্দু পুরোহিতদের আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, পবিত্র অগ্নিকুণ্ডু স্পর্শ করে এবং কপালে তিলক পরে তারপর এসেম্বলী হলে গিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন এবং হাস্যকর হলেও দাবি করেন, ভারত একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ। (পৃঃ-৩৮-৩৯) ভারতের সাম্প্রদায়িক রূপ কখনো পাল্টায়নি। তবে ১৯৯০-এর পর থেকে ক্রমশ তা উগ্র মৌলবাদের রূপ নেয়। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পর বোম্বেতে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর, আবার ১৯৯৩ সালের জানুয়ারীতে দু'দফা মুসলিম নিধন চলে মোটামুটি নির্বিঘ্নেই।

শুধু মুসলমানরাই নয়, ভারতের হিংস্র মৌলবাদী হিন্দুদের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে অন্য ধর্মাবলম্বীরাও। খৃস্টান মিশনারীদের ওপর হামলা, সিস্টার ধর্ষণ, খুন ইত্যাদি প্রায়শই ঘটছে। গুজরানওলা, বোম্বে, দেওয়াস, গাজিয়াবাদ, কারিয়াল প্রভৃতি অঞ্চলে উগ্র হিন্দু মৌলবাদীরা দিনে দুপুরে খৃস্টান মিশনারীগুলোতে হামলা

চালিয়ে সিস্টারদের ধর্ষণ করে যাচ্ছে (কে এস নারায়নম, সানডে, এপ্রিল-১৬-২২, ১৯৯৭)। মৌলবাদী হিংস হিন্দুরা প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিয়েছে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত না হলে কাউকে ভারতে থাকতে দেয়া হবে না।

পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন থেকে সমাজতান্ত্রিকরা ক্ষমতায়। অথচ সেখানেই ১৯৯৫ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা আশোক সিংহল ঘোষণা করেন মুসলমানদের কোরবানী বন্ধ না হলে হিন্দুরা মুসলমানদের মাথা কেটে মা কালীর পায়ে উৎসর্গ করবে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা মাইকে আজান দিতে পারে না, ঈদের সময় প্রকাশ্যে কোরবানী করতে পারে না।

অতএব বোঝাই যায়, সম্প্রতি গুজরাটে যা ঘটে চলেছে তা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। সাম্প্রদায়িক হিন্দু রাষ্ট্র ভারতের মূল চরিত্রের সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ। ভারতের সাম্প্রদায়িক চরিত্র ছাড়াও আরেকটি বিষয় গুজরাটের হত্যাকাণ্ডে প্রভাব ফেলেছে। তা হল আন্তর্জাতিকভাবে মুসলমানদের ওপর নানামুখী আঘাত, বিষেশত আমেরিকা ও বৃটেনের তরফ থেকে।

পুরো পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে গুজরাটের মুসলিম গণহত্যাকে পৃথিবীব্যাপী জাতিগত নির্মূল অভিযানের সম্প্রসারণই বলা যায়। বসনিয়ায়, কসোভায়, ফিলিস্তিনে, কাশ্মীরে যেভাবে মুসলমানদের নির্মূলের লক্ষ্যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে, গুজরাটেও তাই হচ্ছে। তফাত এই যে গুজরাটে সরকারের সেনাবাহিনী সরাসরি হত্যাযজ্ঞে অংশগ্রহণ না করে খুনী মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দিয়ে কাজটা করাচ্ছে। দু'মাস ধরে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে। নিহত হয়েছে দু'হাজার মুসলমান, ঘরছাড়া হয়েছে প্রায় এক লক্ষ। কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে তাতে মনে হয় গুজরাটের রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেখান থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর। বৃটিশ কর্মকর্তাদের রিপোর্টেও তাই বলা হয়েছে। মূলত এই-ই হল গুজরাটের ঘটনার ভেতরের চেহারা। ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান ও শরীক দলসমূহ, রাজ্যসরকার, উগ্র হিন্দুদের প্রধান প্রবণতা হল মুসলমানদের উৎখাত। মুসলমানদের সেখানে থাকতে দেয়া হবে না। মুসলিম দেশগুলো এখনও আফগান সংকটের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি, তার উপর ফিলিস্তিনে ইসরাইলের নারকীয় হত্যাকাণ্ডে দিশেহারা, ঠিক এমন একটা সময়েই গোধরা স্টেশনে ট্রেনে আগুন জ্বলল, মুসলিম হত্যাযজ্ঞ শুরু হল। গুজরাট ইস্যু নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনা বা চাপ সৃষ্টির সময় ও সুযোগ কোনটাই মুসলিম দেশগুলোর কাছে নেই। সন্দেহ নেই একটি অস্বাভাবিক এবং মোক্ষম সময়ই বেছে নিতে পেরেছে ভারতের মৌলবাদী সরকার এবং হিংস্র মৌলবাদী দলগুলো। তারা জানে এখন আমেরিকা ইসলামী মৌলবাদের অজুহাত তুলে পৃথিবীব্যাপী স্বাধীনচেতা মুসলমানদের ধ্বংস

করার চেষ্টায় নেমেছে। পৃথিবীর সর্বত্র মুক্তবুদ্ধির মুসলিম দলগুলোর মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ মুহূর্তে ভারতে মুসলমানদের পাইকারী হারে হত্যা করলেও পশ্চিমা বিশ্ব মুখ খুলবে না, হয়ত প্রসন্নই হবে। বাস্তবে ঘটছেও তাই। গুজরাটে পশুর প্রবৃত্তি নিয়ে হিন্দুরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুসলমানদের ওপর। অথচ মানবাধিকারের প্রবক্তা পশ্চিমা বিশ্ব নিশ্চুপ কুলুপ আটা।

॥ দুই ॥

গত এক যুগ ধরে একটা সংগঠিত প্রচেষ্টা চলছে বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা লাগানো, দেশটিকে সাম্প্রদায়িক দেশ বলে প্রমাণ করার একটি সংগঠিত চক্রান্ত এখন প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। আওয়ামী লীগ এবং তাদের কলাম লেখকরা এ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নিষ্ঠার সাথে। মাঝখানে বছর পাঁচেক বিরতি ছিল, যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। এবারের নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর থেকে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা উস্কে দেয়ার। হিন্দু নির্যাতনের মিথ্যা সংবাদ ছেপে হিন্দুদের উস্কে দেয়ার চেষ্টা, গোপনে পুজোর মূর্তি ভেঙ্গে গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়াস, এমনকি ভারতে গিয়ে ভারত সরকারকে ব্যবহারের চেষ্টাও তারা বাদ দেয়নি। কিন্তু বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের ধৈর্য ও মানবিক মূল্যবোধ এদেশকে পৃথিবীর সবচেয়ে অসম্প্রদায়িক দেশ বলে দাবি করার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। গুজরাটের ঘটনার রেশমাত্র গোলযোগ এখানে হয়নি। এ আমাদের অহংকার।

ভারত আমাদের নিকতম প্রতিবেশী। এক দেশের সাম্প্রদায়িক ঘটনা আরেক দেশকে প্রভাবিত করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যদিও গুজরাটের মুসলিম হত্যাযজ্ঞের প্রভাবে আমাদের দেশে এখনও কোন সহিংস ঘটনা ঘটেনি। কারণ, আমাদের দেশের মানুষ এখনও খাঁটি মুসলমান, আর মুসলমানরা অসাম্প্রদায়িক, মানবিক বোধ ও আবেগ তাদের বিলুপ্ত হয়নি, কারণ এদেশের মানুষ হিংস্র ভারতীয় হিন্দু মৌলবাদীদের মত মানুষরূপী পশুতে পরিণত হয়নি। এ আমাদের সৌভাগ্য।

অবশ্য এ অহংকার, এ সৌভাগ্যও কতদিন ধরে রাখা যাবে তাতে সন্দেহ। কারণ আওয়ামী লীগ এবং তার কলমবাজ চক্র নিয়ত সক্রিয় রয়েছে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টায়। এরা নিজেদেরকে মানবতাবাদী বলে দাবি করে। তাদের দাবি যদি মেনে নিই, তাহলে যে জলজ্যান্ত প্রশ্নটি সামনে চলে আসে তা হল– গুজরাট যখন জ্বলছে, তখন এইসব মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীরা কোথায়? গুজরাটে যারা নিহত হচ্ছে তারাও তো মানুষ। তাহলে গুজরাটে যখন হিংস্র মৌলবাদীদের মুসলিম গণহত্যার মহা উৎসব চলছে, তখন মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীরা নীরব হয়ে আছেন কি করে? তারা তো মানবতাবাদী।

পৃথিবীর যে কোন মানুষই তাদের কাছে সমান। মানবতাবাদীর কাছে একজন অপরাধীও প্রথমে মানুষ তারপর অপরাধী। অর্থাৎ প্রচলিত আইন ও প্রথা অনুযায়ী মানবিক অধিকার সে ভোগ করবে হোক সে অপরাধী। এদেশের স্বঘোষিত মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীরা এখন কোথায়? অথচ বাংলাদেশে কোন সাম্প্রদায়িক সংঘাত ছাড়াই এরা গত এক যুগ ধরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। গুজরাটের হত্যাকাণ্ডে তাদের কিছুই বলার নেই কেন? আনিছুজ্জামান মাত্র কিছুদিন পূর্বেই তার একটি সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার দেখে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন এবং পরোক্ষে ভারতের মানুষের অসাম্প্রদায়িকতার প্রশংসাও করেছিলেন (প্রথম আলো, ৯-১২-২০০১)। আনিসুজ্জামানের অসাম্প্রদায়িক ভারতে এখন যে মুসলমানদের শিয়াল-কুকুরের মত হত্যা করা হচ্ছে, আনিসুজ্জামান একটা কথাও বলেননি কেন? ২৬-১১-২০০১ তারিখের প্রথম আলো পত্রিকায় আব্দুল্লাহ আবু সয়ীদ সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে উদ্ভট ও বানোয়াট তথ্য প্রচার করেন। একইভাবে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কিত শিক্ষক জাফর ইকবালও লিখেছেন যে, নির্যাতনের কারণে সংখ্যালঘুরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। (প্রথম আলো, ২২-১০-২০০২)। এরা গুজরাটের হত্যাকাণ্ড বা ফিলিস্তিনের মুসলিম নিধন নিয়ে কিছু বলতে নারাজ।

শিশুতোষ লেখক শাহরিয়ার কবির পূর্ণাঙ্গ দু'টি গ্রন্থই লিখে ফেলেছেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের কল্পকাহিনী নিয়ে। গত বছর অক্টোবরে সরকার বদলের সাথে সাথে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। সেখানে অবস্থানকালে বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতায় (যেমন স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন) তার অংশগ্রহণের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। শাহরিয়ার কবিরকে মানবাধিকার কর্মী বলে প্রচার করা হয়েছে। গুজরাটের মুসলমানরা মানবাধিকার তো দূরের কথা, বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও হারিয়েছে। আমাদের বহু পরিচিত শাহরিয়ার কবির সাহেব তো একটা শব্দও উচ্চারণ করেননি। অথচ বিদেশী অমুসলিম সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা গুজরাটের পাশবিক ঘটনার খবর সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরছে।

এ ধরনের কলমবাজদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। উপরোক্তদের সাথেই আছেন জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরী, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর মত প্রবীণরা এবং আবেদ খান, আবুল মোমেনসহ আরও অনেক নব্য কলাম লেখক। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এদের কাজের ধরন ও লক্ষ্যও বদল হয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে এদের প্রধান কাজ হল শেখ হাসিনার এবং শেখ মুজিবের গুণকীর্তন করা, জিয়াউর রহমান ও বিএনপির বদনাম করা। উদ্দেশ্য আওয়ামী

লীগের ফ্যাসিস্ট চরিত্র জনগণের নিকট থেকে আড়াল করে রাখা। যখন বিএনপি ক্ষমতায় আসে তখন এদের প্রধান দায়িত্ব হয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের বানোয়াট কাহিনী ছাড়ায়ে বিদেশী ও সাহায্য ও বিনিয়োগ হ্রাস করে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করে বিএনপিকে ক্ষমতাচ্যুত করা। বস্তুত এটাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। এদের নির্মম মস্তিষ্কে এ বোধটুকু কাজ কবে না যে, সংখ্যালঘু নির্যাতনের কল্পিত খবর ছড়িয়ে আসলে সমগ্র দেশ এবং জাতিরই ক্ষতি করছে তারা।

এসব লেখকরা নিজেদেরকে মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী বলে দাবি করে। গুজরাটে প্রতিদিনই মুসলমানদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার তাতে মদদ দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীরা একটা কথাও বলছেন না। এর কারণ কি? কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুদের কিছু না হলেও এরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেন। দেখা যাচ্ছে এসব বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে যে বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে উঠেছে সেগুলো হল ঃ (ক) এরা আওয়ামী লীগের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সংখ্যালঘু নির্যাতনের মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে, যা পরিণামে দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। (খ) সংখ্যালঘু নির্যাতনের বানোয়াট সংবাদ প্রচারের পেছনে ভারতের হিংস্র হিন্দু দলগুলোর সমর্থন ও স্বার্থ রয়েছে। এদের অনেকে ভারতের বিশেষত কলিকাতার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে। (গ) ভারতের মৌলবাদী হিন্দুদের স্বার্থে আঘাত আসে এমন কাজ থেকে এরা বিরত থাকে। (যেমন গুজরাটের ভয়াবহ মুসলিম গণহত্যায় এরা নীরব)। এ তিনটি পরিস্থিতি থেকে যা জানা যাচ্ছে তা হল, এসব বুদ্ধিজীবীরা একদিকে আওয়ামী লীগের স্বার্থরক্ষার জন্য বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতা চালাতেও পিছপা হয় না, অন্যদিকে ভারতের উগ্র মৌলবাদী হিন্দুদের স্বার্থে আঘাত লাগার আশংকায় মুসলিম হত্যাযজ্ঞেও ভ্রূক্ষেপ করে না। এই হল আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃত রূপ। একই সাথে মুসলিমবিদ্বেষী এবং ব্যক্তিগত হীন স্বার্থ উদ্ধারে প্রয়োজনে বাংলাদেশবিরোধী।

এসব কলামবাজদের আশ্রয় হল কয়েকটি পত্রিকা। এসব পত্রিকা আওয়ামী লীগের মুখপত্রের মত কাজ করে। ফিলিস্তিনে এতবড় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু পত্রিকাগুলো সেসব সংবাদ ঠিকমত প্রকাশ করেনি। গুজরাটে নারী-শিশু-বৃদ্ধসহ হাজার হাজার মুসলমান পশুতুল্য হিন্দু মৌলবাদীদের হাতে প্রাণ হারাচ্ছে। এসব পত্রিকা সে খবরও ভাল করে প্রকাশ করছে না। এর একটাই কারণ হতে পারে যে, এরা ভারতের স্বার্থহানিকর কাজ করবে না। কিন্তু একটা বিষয় মনোযোগের দাবি রাখে। তাহল আমাদের ট্যাক্সের পয়সা নিয়ে সরকার চলে। আর এসব পত্রিকা চলে সরকারি বিজ্ঞাপনে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যেসব পত্রিকা

অমানবিক মনোবৃত্তি নিয়ে সাংবাদিকতার নামে মিথ্যাচার ও কলংক সৃষ্টি করছে, যারা ফিলিস্তিনের হত্যাযজ্ঞ বা গুজরাটের মুসলিম গণহত্যার সংবাদও ভাল করে ছাপে না; যারা বাংলাদেশকেই মৌলবাদী দেশ বলে প্রচারণা চালায়, সংখ্যালঘু নির্যাতনের বানোয়াট খবর ছাপে, তাদেরকে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে পোষার মানে কি? কার সর্বনাশ করার জন্য এদের পুষব আমরা? বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির সর্বনাশের জন্য?

এরপর আসা যাক রাজনীতিবিদদের প্রসঙ্গে। আব্দুস সামাদ আজাদ এদেশের প্রবীণতম রাজনীতিবিদ। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন বহু বছর। তিনি সম্প্রতি বলেছেন যে, বাংলাদেশে গুজরাটের মতই সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে। প্রথমত তিনি গুজরাটের ঘটনা নিয়ে প্রায় কোন প্রতিবাদই করেননি। অথচ এখন বলছেন, বাংলাদেশে গুজরাটের মত হিন্দু নিধন চলছে। আমরা জানি না তিনি কোন বাংলাদেশের কথা বলছেন। সামাদ বলেন না কেন বাংলাদেশের কোন জায়গায়, ক'জন হিন্দুকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে? এরকম মিথ্যাচার কি করে সম্ভব? সরকার এখনও কিছুই বলেনি। সামাদ সাহেবের বক্তব্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কে দেয়ার মত ব্যাপার। তাছাড়া তিনি এ ধরনের বানোয়াট কথা বলে বিদেশের কাছে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছেন। তা করার অধিকারই বা তাকে কে দিয়েছে? সরকারই বা কিছু বলছে না কেন। দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য আইন আছে, আইন আছে বানোয়াট ও উস্কানিমূলক সংবাদ প্রচারণার জন্য। তবু এ চক্রটি দেশের ভেতরে বসে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কি করে? সরকার নীরব। তাহলে দেশের এবং দেশের মানুষের স্বার্থ দেখবে কে? গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার প্রসঙ্গে আসি। গুজরাটের ঘটনায় আমাদের প্রত্যক্ষ স্বার্থ নেই, আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ক্ষতিও নেই। কিন্তু মানবকি স্বার্থ আছে, মানবিক ক্ষতির নিশ্চিত আশঙ্কা আছে। সমগ্র মানবসমাজের কিছু দায়বদ্ধতা আছে, আছে দায়িত্ব। মানুষের হাতে মানুষের হত্যাকাণ্ডের, বিশেষত গুজরাটের ঘটনার মত ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা আমাদের দায়িত্ব। কাউকে না কাউকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব এর বিরুদ্ধে লিখা, বিবৃতি প্রদান, প্রতিবাদ সভা, মিছিল, প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ- অন্তত এটুকু তো করা যায়। আমরা তাও করছি না। না করলে এ হিংস্রতা কেবল বাড়তে থাকবে। বাড়তে বাড়তে এক সময় গ্রাস করবে সমগ্র মানব সমাজকেই।

উদ্ধৃতি ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১২ মে ২০০২ ॥ লেখক ওবেইদ জাগীরদার।

ভারতে মুসলিম হত্যা ধর্ষণ ঃ তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা

ভারতের রাজনৈতিক নেতারা এটা বেশ গর্বের সঙ্গেই উচ্চারণ করে থাকেন, ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সেই ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ভারতে কি চলছে? পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য গুজরাটে গত দুমাস ধরে চলছে মুসলিম গণহত্যা। চলছে হত্যার বীভৎস তাণ্ডবলীলা। ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে নির্বিচারে নিধন করা হচ্ছে। এ গণহত্যায় রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং এমনকি পুলিশের সংশ্লিষ্টতাও রয়েছে। ভারত এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছে সে একটি পূর্ণাঙ্গ সাম্প্রদায়িক দেশ। ধর্মনিরপেক্ষতা তার একটি নিছক মুখোশ মাত্র।

আর সবচেয়ে লজ্জা ও ঘৃণার কথা এ নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর কোন উদ্বেগ নেই। শত প্রতিবাদের মুখেও তিনি তার রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বহাল রেখেছেন। এমনকি এ গণহত্যার প্রতিবাদে জোট সরকারের কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনিজমন্ত্রী রাম বিলাস পাসোয়ান পদত্যাগ করেন এবং আরও একজন জুনিয়র মন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদিকে নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইট ওয়াচ বলেছে, গুজরাটে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত। রাজ্য সরকার, পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। এই পরিকল্পনামাফিক আগ থেকেই কট্টর হিন্দুরা ভোটার তালিকা এবং মুসলিম মালিকানাধীন সম্পত্তির ঠিকানা সংগ্রহ করেছিল। তারপর সেই ঠিকানা অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিম গণহত্যা ও সম্পত্তি লুটপাট করা হয়। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী শ্যারন যেভাবে কূটকৌশলে ফিলিস্তিনে মুসলিম গণহত্যা চালাচ্ছে, সেই একই পথ অবলম্বন করেছেন ভারতের কট্টর হিন্দুবাদী প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী কোন উদ্বেগ প্রকাশ না করে এবং গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার জন্য মুসলমানদেরই দায়ী করেছেন। গুজরাটে একটি ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডে কয়েকজন করসেবক হিন্দুর মৃত্যুর ঘটনাকে এক কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনা মুসলমানরা করেছে এমন কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। কিন্তু ট্রেনে অগ্নিকাণ্ড একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সে জন্য দায়ীরা শাস্তি পেতে পারে। কিন্তু এ কারণে গত দু'মাস ধরে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নির্বিচারে ধর্ষণ ও হত্যা করা যেতে পারে না। রাজধানী আহমেদাবাদ থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রতিটি শহর এবং এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামেও বেছে বেছে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে। আর সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হল, এ হত্যার

প্রতিবাদে ভারতের লোকসভা একটি নিন্দা তথা তিরস্কার প্রস্তাবও পাস করতে পারেনি। গত ৩০ এপ্রিল লোকসভায় তীব্র বিতর্ক হয়েছে। কংগ্রেস উত্থাপিত একটি নিন্দা প্রস্তাব ১০০ ভোটের ব্যবধানে বাতিল হয়ে যায়। এই হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের আইনসভা। এ আইনসভা সুপরিকল্পিতভাবে সংঘটিত সহস্রাধিক মুসলিম গণহত্যার ঘটনায় একটি নিন্দা কিংবা তিরস্কার প্রস্তাবও পাস করতে পারে না।

আর এভাবে ভারতের আইনসভা প্রকারান্তরে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকে এবং গুজরাটের রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পরোক্ষভাবে মুসলিম নিধনে সমর্থন যোগাল।

একটি পার্লামেন্ট এবং এর সদস্যরা একটি দেশের বিবেক। কিন্তু ভারতের সেই পার্লামেন্ট এতটুকু নিন্দাও করতে পারল না নৃশংস মুসলিম গণহত্যার। এভাবেই অহিংসবাদী করমচাঁদ গান্ধীর ভারতে এখন জ্বলছে হিংসার আগুন। এই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত। তার আজকের চরিত্র। এখানে অনায়াসেই মুসলমানদের মসজিদ ভাঙ্গা যায়। এমনকি অযোধ্যায় বাবরী মসজিদের মত একটি ঐতিহাসিক নিদর্শনকেও মুহূর্তেই ধূলায় গুঁড়িয়ে দেয়া যায়। সংখ্যালঘুরা এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই।

তারপরও ভারত বলে সে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। গণতন্ত্রের দেশ। অথচ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সামান্যতম উপলব্ধি নেই। ধর্মনিরপেক্ষতার লেশমাত্র নেই। ধর্মনিরপেক্ষতার খোলসে সে একটি হিংস্র ভয়ংকর বাঘ। সংখ্যালঘু মুসলমানদের গিলে খাওয়াই সে বাঘের ধর্ম। তারপরও তার বড় গলা। ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের সংবিধানের একটি অন্যতম শর্ত। কিন্তু সেই শর্তকে আজ গলাটিপে হত্যা করছে বাজপেয়ীর হিংস্র নরখাদকেরা। অথচ বাংলাদেশ ধর্মীয়ভাবে একটি মুসলিম দেশ হয়েও এখানে কোথাও সম্প্রদায়িকতা সেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত প্রেমিক একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলছে, এখানে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন চলছে। তাদের সম্পত্তি লুট হচ্ছে। এমনকি ধর্ষণ পর্যন্ত চলছে। আর এ নিয়ে তারা ভারতে গিয়ে মিথ্যা, বানোয়াট কাহিনী ফেঁদে পরিকল্পিতভাবে ভিডিওতে চিত্রধারণ করে তা ক্যাসেট আকারে দেশ-বিদেশে ফেরি করে বেড়াচ্ছে। আর বলছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বাঁচাও, তাদের কোন নিরাপত্তা নেই। কিন্তু ভারতে যেখানে প্রতিদিন সংখ্যালঘু মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে তাদের নেই কোন উদ্বেগ।

অথচ সেখানে ধর্মের নামে, হিন্দুত্বের নামে মুসলমানদের জবাই ও আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। শিশু, বালিকা, নারীদের ধর্ষণ করা হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের একত্রে জড়ো করে বিদ্যুতের শর্টসার্কিটে আগুন লাগিয়ে ঘরবাড়িসহ

তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। আর এদেশের মিথ্যা প্রচারে বিদেশে লুটিয়ে দেয়া হচ্ছে দেশের সম্মান এবং এসব করা হচ্ছে হীন রাজনৈতিক স্বার্থে। এদিকে দেশের ঘটনা প্রবাহ না দেখেই বিলেতে বসে এক বুদ্ধিজীবী দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নিয়ে যা ইচ্ছে তাই লিখে যাচ্ছে। অথচ ভারতে মুসলিম নিধন তার কলম এড়িয়ে যায়। তার যত হা-হুঁতাস বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নিয়ে।

এসব জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রয়েছে আবেদ খান, শাহরিয়ার কবির গং এবং বিলেতে প্রবাসী আ গা চৌ। অথচ আজ যেখানে ভারতে দিনের পর দিন মুসলমানদের কচুকাটা করা হচ্ছে তখন এরা নিশ্চুপ। এসব বুদ্ধিজীবীদের দেশের বিরুদ্ধে এই অপতৎপরতা নিঃসন্দেহে লজ্জার। এরা জাতিদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী। এদের অবশ্যই রুখে দাঁড়াতে হবে দেশের সচেতন মানুষদের। ভারতে মুসলিম নিধনের প্রেক্ষিতে এরা বিভিন্নভাবে এদেশেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করেছে। বিভিন্নভাবে সন্ত্রাসীদের উসকে দিয়েছে। কিন্তু এদের হীন উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এরা জাতির লজ্জা। জাতির কলঙ্ক। বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। দেশের শতকরা ৯৩ ভাগ লোক মুসলমান হলেও সংখ্যালঘুদের প্রতি সব সময় সংখ্যাগুরুদের সহানুভূতি। ভারতে মুসলিম গণহত্যার সময়েও এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে। এই সম্প্রীতিতে একটি চিহ্নিত মহলের বড়ই গাত্রদাহ হয়। তাদের এটা সহ্য হচ্ছে না। তারা হাতে পাচ্ছে না সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালানোর বড় ধরনের অস্ত্র। তাই অনন্যোপায় হয়ে মিথ্যা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কল্পকাহিনী, পরিকল্পিত ভিডিও চিত্র ইত্যাদি নানামুখী মিথ্যা প্রচারণায় এরা এখন ব্যস্ত। গত নির্বাচন-উত্তর পরিবেশে রাজনৈতিক কারণে কিংবা কেউ প্রতিহিংসা চরিতার্থে দু'একটি সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে থাকতে পারে। নির্বাচনের পর রাজনৈতিক কারণে প্রতিপক্ষের ওপর এরকম দু'একটি বিচ্ছিন্ন হামলার ঘটনা অতীতে সব সময় ঘটেছে। তার জন্য থানা পুলিশ রযেছে। রয়েছে আইন-আদালত; কিন্তু এ নিয়ে অযথা হৈ-চৈ করা কিংবা মিথ্যা প্রচারণা চালনার অবকাশ আছে কি? যা শুধু দেশের সম্মান ক্ষুণ্ন করেছে। বিনষ্ট করেছে ভাবমূর্তি। আজ ভারতে যা ঘটছে তা বাংলাদেশে হলে কি অবস্থা হত? কিন্তু এদেশের মানুষ বড় সহনশীল। ধর্মের কারণে তারা কাউকে ছোট করে দেখে না। কিংবা এ কারণে কারও প্রতি তাদের বিদ্বেষও নেই। হিন্দু বলে কেউ খুন হয়েছে এমন ঘটনা বিরল। কিন্তু তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে অটল বিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদভানী ও নরেন্দ্র মোদীরা যা করছে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। এটা আজ প্রমাণিত। সম্প্রতি চারটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপির চরম ভরাডুবির পর এখন আবার হিন্দুত্ব

ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে কয়েকটি বিধানসভার নির্বাচনে পার পেতে চাইছে বাজপেয়ী। এর মধ্যে গুজরাটও রয়েছে।

ভারতে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল বিজেপির উত্থানই হয়েছে হিন্দুত্ব ও সংখ্যালঘু ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে। বাবরী মসজিদে ও রামমন্দির ইস্যু শুধু বিজেপির দিল্লীর মসনদ দখলের লক্ষ্যেই। ১৯৮২ সালে লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি মাত্র দু'টি আসন পেয়েছিল। পরবর্তীতে বাবরী মসজিদ ও রামমন্দির ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত উত্থান ঘটে বিজেপির। তারপর সত্যি সত্যিই একদিন দিল্লীর মসনদ ও দখল এবং তার স্বপ্ন পূরণের পালা। বিজেপির রাজনীতির মূল থিমই হচ্ছে হিন্দুত্ব ও সাম্প্রদায়িকতা। তাই শুধু নরেন্দ্র মোদী নয়, বাজপেয়ীর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতেই চলছে গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা। যে কোন মূল্যে ক্ষমতা ধরে রাখা চাই বাজপেয়ীর। সাম্প্রতিক নির্বাচনে চারটি রাজ্য হাতছাড়া হয়েছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে আসামি লোকসভা নির্বাচনেও ভরাডুবি অপরিহার্য। এই পরিস্থিতি এড়াতেই এবং আগামী দিনেও ক্ষমতাকে নিশ্চিত করতে বাজপেয়ীর এই হিন্দুত্ব ও সংখ্যালঘু ইস্যু। ভাবতে অবাক লাগে যে, দেশটিতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮ ভাগ লোক বাস করে, সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেই কিভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উসকে দেয়। প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেন, গোধরায় ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাই গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার মূলে কাজ করেছে। ভারতে আজ আর ধর্মনিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই। এটা শুধু কাগুজে বুলি। ধর্মের নামে সংখ্যালঘু মুসলমানদের হত্যাই এখন সেখানে রাষ্ট্রীয় মিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্য দিকে যারা এদেশে পান থেকে চুন খসলেই সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান, সেই তারাই ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মহোৎসবেও তাদের কোন দোষ খুঁজে পান না। যত দোষ বাংলাদেশের। অথচ বাংলাদেশীরা যে সহনশীল ও অসাম্প্রদায়িক তার নজির খুব কম দেশেই রয়েছে।

উদ্ধৃতি ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ৬ মে ২০০২ ॥ লেখক কৃষিবিদ জাবেদ ইকবাল।

ভারতীয় মুসলমানদের নির্যাতনের লক্ষ্যে কালাকানুন

ভারতে একটি নয়া আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। শুরুতেই এ আইনের প্রয়োগ ও লক্ষ্য নিয়ে গুরুতর সন্দেহ ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, সন্ত্রাস দমনের জন্যে এ আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ আইনটি প্রণয়নের পটভূমি ও মনোভাব পর্যালোচনা করা হলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের হয়রানি ও নির্যাতন এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন নস্যাৎ করাই এ কালো আইনের লক্ষ্য। গত ২৬ মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টের

উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে প্রিভেনশন অব টেরোরিজম অর্ডিন্যান্স (পোটো) নামে বিলটি ৪২৫-২৯৬ ভোটে পাস হয়।

প্রথমে পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষ রাজ্য সভায় বিলটি বাতিল হয়ে যায়। এতে সরকারের মাথায় বাজ পড়ে। তখন উভয় কক্ষের যৌথ অভিবেশন ডাকা হয়। যৌথ অধিবেশন ডাকা না হলে বিলটি পাস হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে এ পর্যন্ত পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন হয়েছে মাত্র তিন বার। সর্বশেষ যৌথ অধিবেশন হয়েছে ২৩ বছর আগে। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিরল ঘটনা। তুমুল হট্টগোল ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে পোটো পাস হয়। বিরোধীদলীয় নেত্রী কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী বিলটি পাসের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন যে, সংখ্যালঘু মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যই এ কঠোর আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। ভারতের দু'একটি পত্র-পত্রিকায়ও এ আইনের সমালোচনা করা হয়েছে। এশিয়ান অজ-এ এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়, একটি কঠোর আইন পাসে পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশন ডাকার ঘটনা ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে বলা হয়, ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে যে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থা চালু হয়, যৌথ অধিবেশন হচ্ছে সেই ব্যবস্থার প্রতি একটি অস্বীকৃতি।

পোটের প্রয়োগ শুরু হয়েছে। এই নয়া আইনে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই মুসলমান। কাশ্মীর ও গুজরাটে ব্যাপক ধড়-পাকড় শুরু হয়েছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, পানি কোথায় গড়াচ্ছে। এ আইনে জামিনের বিধান রাখা হয়নি। যে কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে নব্বই দিন আটক রাখা যাবে। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নিয়ে আরো ৯০ দিন আটক রাখা যাবে। এ আইনে পুলিশকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পুলিশ সন্দেহভাজন লোকজনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে এবং তাদের জবানবন্দিও রেকর্ড করতে পারবে। এছাড়া কথিত সন্ত্রাসীদের আশ্রয় ও অর্থদাতাদেরও গ্রেফতার করা যাবে। সন্দেহভাজনদের জবানবন্দি রেকর্ড করে প্রমাণ করা হবে যে, সে সন্ত্রাসী। পুলিশের কাছে দেয়া স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করা যাবে না। পুলিশী নির্যাতন ও রিমান্ডে সাজার ভয়ে আসামিরা অনেক সময় মিথ্যা স্বীকারোক্তি করে। পরে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তা অস্বীকারও করে। তখন পুলিশের কাছে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যায়। ভারতে নয়া আইনের ক্ষেত্রে এ রকম কোন সুযোগ নেই। সরকার বলছে যে, ডিসেম্বরে পার্লামেন্ট এবং পরে কলকাতায় মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলার মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে এ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ঘটনায় যাদের সন্দেহ ও গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের একজনও হিন্দু অথবা অমুসিলম নয়। প্রথমোক্ত ঘটনার জন্য দায়ী করা

হয় পাকিস্তানভিত্তিক কাশ্মীরী মুসলিম সংগঠন লস্কর-ই তৈয়্যেবা ও জয়শ-ই মোহাম্মদকে। শেষোক্ত ঘটনার জন্যে দায়ী করা হয় বাংলাদেশভিত্তিক নাম না জানা অস্তিত্বহীন সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইকে। ভারত এ দুটি সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য অন্যকে যতই দোষারোপ করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই হচ্ছে এসব ঘটনার হোতা। ভারতীয় মুসলমানদের হয়রানি এবং কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামকে 'সন্ত্রাসবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য ভারতীয় পার্লামেন্ট ভবন ও কলিকাতায় মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুসলমানরা। সুতরাং উল্লিখিত সন্ত্রাসী হামলার জন্য ভারত মুসলমানদের দোষারোপ করলেও কোন যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভব না। মুসলমানরা কখনো নিজেদের ক্ষতি নিজ হাতে করতে পারে না। এ মুহূর্তে সন্ত্রাসী হামলা যারাই করুক না কেন, দায়ী করা হয় কেবল মুসলমানদের। ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা থেকে এ প্রবণতা শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানে নামে। ভারতীয় কর্মকর্তারা সন্ত্রাসবাদবিরোধী মার্কিন অভিযানের দিকে তাকিয়ে দেখতে পান যে, যুক্তরাষ্ট্র যে যুক্তিতে এ অভিযান শুরু করেছে তাদেরও একই যুক্তিতে অনুরূপ অভিযান চালাতে কোন বাধা নেই। তবে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ১১ সেপ্টেম্বর যে হাতিয়ার তুলে দিয়েছে ভারতের হাতে তেমন কোন হাতিয়ার বা সুযোগ তখন ছিল না। এ ঘাটতি পূরণের জন্যই ২২ ডিসেম্বর লোকসভা ভবনে হামলা করানো হয়। হামলা করা হয় ঠিক তখন; যখন লোকসভা অধিবেশন মূলতবী করা হয়েছে এবং সকল মন্ত্রী ও এমপিরা লবি ত্যাগ করেছেন। হামলায় নিহত হয় ১৪ জন। তাদের ৮ জন পুলিশের লোক ও ৬ জন হামলাকারী। হামলাকারীরা প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং রাষ্ট্রের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে নিরীহ পুলিশ হত্যার জন্য নিজেদের জান দিতে পারে না। মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ও এমপিদের হত্যা করার মনোভাব থাকলে তারা অধিবেশন চলাকালে হামলা চালাতে পারতো। কিন্তু তারা তা করেনি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হামলাকারীদের লক্ষ্য ছিল অন্যকিছু। ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া থেকেই নয়াদিল্লীতে পার্লামেন্ট ভবনে হামলার রহস্য বোঝা যায়। ভারত সরকার পার্লামেন্ট ভবনে হামলার জন্য যতই গরম মেজাজ দেখাক না কেন, ভেতরে ভেতরে সে বেজায় খুশি। সে যা চেয়েছিল পার্লামেন্ট ভবনে সাজানো হামলার মধ্যদিয়ে সে তা পেয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মত সেও তারস্বরে 'সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী' বলে চিৎকার করছে। কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামকে 'সন্ত্রাসবাদ' হিসেবে আখ্যায়িত করছে। সংখ্যালঘু মুসলমানদের 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়ে শ্রীঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আজন্মের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে। একই সঙ্গে প্রতিবেশী পাকিস্তান ও

বাংলাদেশকে 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র' হিসেবে চিহ্নিত করে এদেরকে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ফেলে দেয়ার মোক্ষম সুযোগ পেয়েছে। এক ঢিলে কত পাকি সে মারছে। সুবিধার ফিরিস্তিই প্রমাণ করে যে, নয়াদিল্লীতে পার্লামেন্ট ভবনে ভারতের স্বার্থে ভারতের জন্য এবং ভারতের সরকার দ্বারাই হামলা হয়েছে।

নয়াদিল্লীতে পার্লামেন্ট ভবনে সন্ত্রাসী হামলায় ভারত অনেক সুবিধা অর্জন করলেও সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রকে তার হীন স্বার্থের সাথে একীভূত করতে পারেনি। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য কলিকাতায় মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলা করা না হয়। তবে এ হামলায় কোন মার্কিন নাগরিক হতাহত হয়নি। নয়াদিল্লীর মত এখানেও নিহত হয়েছে শুধু পুলিশ। একেই বলে 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ করে, উলুখাগড়া পুইড়া মরে'।

ভারতের কুৎসিত ষড়যন্ত্রে নির্দোষ পুলিশকে প্রাণ দিতে হয়েছে। দুটি সন্ত্রাসী ঘটনায় একজন পুলিশ অফিসারও নিহত হননি। এটাও ভেবে দেখার মত একটি বিষয়। কলিকাতায় মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা থেকে ভারত যে রাজনৈতিক ও কৌশলগত সুবিধা হাসিল করতে চেয়েছিল তা সে পারেনি। ঘটনার দিন মার্কিন এফবিআই পরিচালক রবার্ট মুলার ভারত সফরে এসেছিলেন। তিনি তার নিজস্ব চ্যানেলে জানতে পারেন যে, মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে হামলার সঙ্গে আই এসআই অথবা বাংলাদেশী কোন নাগরিক জড়িত নন। মার্কিন কর্মকর্তারা তদন্ত করে বুঝতে পারেন যে, ভারতে চলমান কথিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী ধরপাকড়ে মার্কিন সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যেই কলিকাতায় মার্কিন প্রতিষ্ঠানে বোমা নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ করা হয়েছে।

ভারত নিজেকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দাবি করে। কিন্তু বাস্তবে সে একটি চরম বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক দেশ। ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেও ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যালঘু এখনো পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। প্রভু বদল হয়েছে মাত্র। ব্রিটিশ প্রভুদের স্থলে ভারতীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রভু। পার্থক্য শুধু এই-ই ভারতীয় মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখা হয়। তাদের আনুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়। চুন থেকে পান খসলেই তাদেরকে পাকিস্তানে চলে যেতে বলা হয়। ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় যতই ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়াক না কেন, তারা নিজেরাও জানে যে, তাদের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়, এটা হচ্ছে তাদের বাহানা মাত্র। ধর্মনিরপেক্ষতার বাহানা করে, তারা কাশ্মীরীদের ধরে রাখতে চাইছে। কাশ্মীর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ভারতের যে শুধু অঙ্গহানি হবে তাই নয়, তার ধর্মনিরপেক্ষতার ভেকও খসে পড়বে। তখন সে যে মূলত হিন্দু রাষ্ট্র তাই প্রমাণ হবে।

৭—

কাশ্মীর হচ্ছে ভারতের গলার কাঁটা। সে না কাশ্মীরের মায়া কাটাতে পারছে, না সে ফেলে দিতে পারছে। পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর জন্মভূমিকে অবৈধভাবে ধরে রাখতে গিয়ে ভারতকে জ্বলে-পুড়ে মরতে হচ্ছে। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে দুটি যুদ্ধ হয়েছে। ১৯৯৯ সালে কারগিল সংকটে দুটি দেশের মধ্যে চতুর্থ বারের মত যুদ্ধ বেধে যাবার উপক্রম হয়েছিল।

এখনো কাশ্মীর সীমান্তে উভয় দেশের সৈন্য মোতায়েন রয়েছে। প্রায়ই গুলিবিনিময় হয়। এমন কোন দিন নেই যেদিন কাশ্মীরে ৫/১০ জন মারা যায় না। পাকিস্তান ও ভারতের হাতে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি আজ পারমাণবিক অস্ত্রও রয়েছে। কাশ্মীর বিরোধই দুটি দেশকে পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত হতে বাধ্য করেছে। অতীতের যুদ্ধগুলো ছিল প্রচলিত। কিন্তু ভবিষ্যৎ যুদ্ধ তা নাও হতে পারে। দুটি দেশই বার বার বলছে যে, সর্বশেষ উপায় হিসেবে তারা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে। পারমাণবিক অস্ত্র কেউই ব্যবহার করতে চায় না। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এ অস্ত্র আর কখনো ব্যবহার করা হবে না, এ নিশ্চয়তা কারো পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। তবে কোথাও যদি পরমাণু যুদ্ধ বেধে যায় তাহলে তা হবে এ উপমহাদেশে এবং কাশ্মীর বিরোধই হবে তার কারণ ও কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু বিশ্বের সেদিকে খেয়াল নেই। আজকের বিশ্ব মুলত মার্কিন প্রভাবাধীন বিশ্ব। এখানে তার কথাই সব। তার ইচ্ছাই ইচ্ছা। সে আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে দেশটিকে শ্মশান বানিয়ে দিয়েছে। তবু তার খায়েশ মিটছে না। প্রতিটি মুসলিম দেশকেই সে সন্দেহ করছে। তার তালিকায় যে কটি দেশ সন্ত্রাসবাদী দেশ হিসেবে চিহ্নিত তাদের প্রতিটিই মুসলিম দেশ। নিয়তি যুক্তরাষ্ট্রকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে, যেখানে আগে আমরা ভারত ও ইসরাইল ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। ১১ সেপ্টেবরের পর বিশ্ব বদলে যাওয়ায় এ তিনটি দেশ একই সরলরেখায় এসে দাঁড়িয়েছে। এদের সুখ-দুঃখ অভিন্ন। হৃদয়ে একই সুর। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখবো যে, আমেরিকা যেখানে এসে থেমে গেছে, ভারত সেখান থেকে শুরু করেছে। আবার ভারত যেই ঝিমিয়ে পড়েছে অমনি ইসরাইল গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। ওরা যেন একই বৃত্তে প্রদক্ষিণ করছে। কখনো চলছে একা আবার কখনো বা একত্রে। ভারত বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদবিরোধী মার্কিন লড়াইয়ে সমর্থন দিয়েছে সবার আগে। যুক্তরাষ্ট্র এর প্রতিদান দিয়েছে। ভারতের সন্ত্রাসবাদ দমন আইনকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। এই হচ্ছে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র। আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রতিটি ব্যক্তি ও সংগঠন যেখানে পোটো পাস হওয়ায় শংকিত হয়ে উঠেছে। সেখানে বিশ্বের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ঠিকাদার যুক্তরাষ্ট্রের এতটুকু বাধলো না। আর

বাঁধবেই বা কেন। মানবাধিকার লংঘিত হলে মুসলমানদের মানবাধিকারের লংঘিত হবে। তাতে কি! মুসলমানরা মৌলবাদী। ধর্মান্ধ, গোঁড়া। তবে অন্য কারো মানবাধিকার লংঘন করা যাবে না। আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে আগ্রাসী ইহুদীদের হত্যা করা যাবে না। কাশ্মীরেও চুপচাপ থাকতে হবে। নয়তো সন্ত্রাসীর তালিকায় নাম উঠবে এবং পরিণতি হবে তালেবানদের মত। এরকম একটা মনোভাব সর্বত্র। এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও। মার্কিন প্রচারণায় বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে এমন একটা আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে যে, কেউ নিজেকে মৌলবাদী হিসেবে জাহির করতে চাচ্ছেন না। বলছেন তারা মধ্যপন্থী ও উদার, কিন্তু ইসলাম এক ও অভিন্ন। এখানে মৌলবাদ বলতে যেমন কোন মতবাদের অস্তিত্ব নেই তেমনি মধ্যপন্থী ও উদারনৈতিক হওয়ারও কোন সুযোগ নেই। যদি কেউ ইসলামের বাইরে চলে যেতে চান, তাহলে সেই স্বাধীনতা তার আছে। কিন্তু ইসলামের ভেতরে থেকে ইসলামকে বিভাজিত করার অধিকার কারো নেই। মুসলমান হিসেবে ঠিক থাকতে হলে বলতে হবে, মৌলবাদ-অমৌলবাদ বুঝি না, মুসলমান হিসেবে বিশ্বনবী (সা.) হচ্ছেন আমাদের আদর্শ এবং আল কোরআন হচ্ছে আমাদের সংবিধান। এতটুকু যার বলার সাহস নেই, তিনি হয় দুর্বল ঈমানের লোক নয়তো অমুসলিমদের দোসর। একটি ঘটনা হলে কথা ছিল না। একটির পর একটি ঘটনা ঘটেই চলছে। তারপরেও কি মুসলমানদের চোখ খুলবে না? মুসলমান ছাড়া বিশ্বে আর কোন জাতি নির্যাতিত হচ্ছে? কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, কসভো, চেচনিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক, আরাকান, মিন্দানাও– সবগুলোই মুসলিম।

আমাদের দেশে একশ্রেণীর লোক সংখ্যালঘুদের জন্য চোখের পানি ফেলছে। বলছে, এদেশে নাকি সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব একথা নিশ্চয়ই সাক্ষ দেবে যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা যতটুকু নিরাপদে রয়েছে, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠরাও ততটুকু নিরাপদে নেই। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যতগুলো বোমাবাজি ও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর প্রত্যেকটির জন্য দায়ী করা হয়েছে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের টুপি-দাড়ি ও পাঞ্জাবী পরিহিত লোকজনকে। সিনেমা, টিভি ও প্রচারমাধ্যমে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে মুসলমানদের পোশাক-আশাক নিয়েই। এগুলোকে কেউ মুসলিম নির্যাতন বলেন না। কেন মুসলমানদের প্রতি এ বিমাতাসূলভ আচরণ? তা কি ভারতের মন জয় করার জন্য? ভাগ্যিস দ্বিজাতিতত্ত্বের পরবর্তী ফসল বাংলাদেশে তারা বাস করছেন। ঘটনাক্রমে ভারতের সীমানায় তাদের জন্ম হলে বুঝতে পারতেন হিন্দু মৌলবাদ কী জিনিস। গুজরাটের মুসলমানরা বুঝতে পেরেছে। হাজার হাজার মুসলমানকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এখনো মুসলমানরা তাদের বাড়ি–ঘরে ফিরতে

পারছে না। নিজ দেশে শরণার্থী হয়ে পথে পথে ঘুড়ে বেড়াতে হচ্ছে। গভীর যন্ত্রণায় গুজরাটের এক মুসলমান বলেছেন, "আমি আর কখনো গাইব না, সাঁরে জাহাছে আচ্ছা হিন্দুস্তা হামারা" গুজরাটের মুসলমানদের আগুনে পুড়িয়ে মেরেও ভারতের হিন্দুত্ববাদী সরকারের সাধ মিটেনি। এবার 'সন্ত্রাসী' হিসেবে তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য পোটো প্রণয়ন করা হয়েছে। গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহতদের ৯৯ শতাংশই মুসলমান। তারপরও দাঙ্গার জন্য তাদেরকেই অভিযুক্ত করা হচ্ছে। পোটোর আওতায় ৭শ' মুসলমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আইন পাস হতে না হতেই মুসলমানদের এ অবস্থা। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলতে থাকলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা সহজেই অনুমেয়। কয়েক বছর আগে কুখ্যাত টাডা আইন করে শিখ বিদ্রোহ দমন করা হয়। এবার কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নির্যাতিত মুসলমানদের মানবাধিকার হরণের জন্য করা হয়েছে পোটো। *ইনকিলাব, ৪ মে ২০০২ ॥ সাহাদত হোসেন খান।*

ভারতের গুজরাটে গণহত্যা ও গণধর্ষণ বাজপেয়ী এখনও মুসলমানদের দায়ী করছেন

গত ১৩ এপ্রিল ২০০২ তারিখে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ভারতের বহুল প্রচারিত দৈনিক *স্টেটসম্যান* পত্রিকার কলিকাতা 'লেট সিটি' সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষ সংবাদে প্রকাশ, গোয়া রাজ্যে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নির্বাহী পরিষদের এক সভায় ভাষণ দানকালে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী উগ্রবাদী হিন্দু সন্ত্রাসীদের পরিবর্তে ভারতের নিরীহ, নিরস্ত্র মুসলমানদের এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দায়ী করেছেন। উল্লিখিত পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের অংশ বিশেষ সুহৃদ পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

Where Muslims are Mr. Atal Behari Vajpayee said at the BJP executive Gonelave in Goa, they don't want to live in peace." তিনি আরও বলেছেন,

"They don't want to mix with others. Instead of propagating their message through peace they use terror as a weapon"

এই সংবাদটির 'ইনসেট' ছিল নিম্নরূপ ঃ

On Gujarat riots one must not forget who lit the fire and how it spread on Islamic terrorism Wherever Muslims are, they don't want to live in peace They don't want to mix with others (they) use terror as weapon"

তিনি পবিত্র জিহাদের মূল্যবোধকে কটাক্ষ করে বলেছেন,

...One version of lslam taught love, peace and compassion, ...lslam today was being used for militancy and jihad and trying to bring the world under its influence"

তার বক্তৃতার অধিকাংশটা জুড়েই ছিল মুসলমানবিদ্বেষী কথাবার্তা। আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, ভারতের উগ্রবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ, করসেবক, শিব সেনা ইত্যাদি চরমপন্থী দলের সন্ত্রাসীদের দায়মুক্ত করার জন্যই তিনি এ ধরনের কথাবার্তা বলে চলেছেন। কারণ অপরাধীর সাফাই না গাইলে সে অপরাধী বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। যাই হোক, দুর্গন্ধ ছাইচাপা দিয়ে বেশীক্ষণ রাখা যায় না, দুর্গন্ধ বের হবেই এবং তা-ই হয়েছে। গুজরাটের মুসলিম নিধন সম্পর্কে গত ২৭ এপ্রিল দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার প্রথম প্রষ্ঠায় প্রকাশিত এক খবরে ভারতে অবস্থানরত বৃটিশ কর্মকর্তাদের এক গোপন রিপোর্টের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, গুজরাটে মুসলিম গণহত্যা পূর্বপরিকল্পিত। রাজ্য সরকারের মদদ ও সমর্থনে তা পরিচালিত হয়েছে। পত্রিকায় আরও বলা হয়েছে, প্যারিসভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা বলেছে, গুজরাটের দাঙ্গা দমনে রাজ্য সরকার ও রাজ্য পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে এবং দাঙ্গায় প্রায় ২ হাজার লোক নিহত হয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া এদের প্রায় সকলেই মুসলমান। এই সংবাদটিতে আরও বলা হয়েছে, বৃটিশ কর্মকর্তাদের একটি অভ্যন্তরীণ রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বিবিসি জানায়, রিপোর্টে কর্মকর্তারা বলেন, উক্ত সহিংসতাকালে জাতিগত নির্মূল অভিযানের সকল রকম আলামত বা বৈশিষ্ট্য ছিল এবং মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কোন সমঝোতা অসম্ভব।"

এই রিপোর্টে অন্যত্র বলা হয়েছে, "গুজরাটে বৃটিশ কর্মকর্তাদের তদন্ত রিপোর্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়, গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল পরিকল্পিত। সম্ভবত কয়েক মাস আগে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। রাজ্য সরকারের সমর্থনে উগ্রপন্থী হিন্দু সংগঠন এই দাঙ্গা শুরু করে। এটা কোনভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। রিপোর্টে বলা হয়, হিন্দু এলাকাসমূহ থেকে মুসলমানদের বিতাড়ণ করাই এই দাঙ্গার লক্ষ্য। এ দাঙ্গার ২ হাজার লোক নিহত হয়েছে। এর মধ্যে বেশীরভাগ মুসলমান।' ভারতের যে অঞ্চলই মুসলমানপ্রধান সেই এলাকাকে হিন্দুপ্রধান করার জন্য গায়ে নামাবলি, কপালে শ্বেতচন্দন ও সিঁদুরের ফোঁটা আর মুখে 'রাম' নাম জপতে জপতে

একদিকে 'অহিংস পরম ধর্ম'র স্লোগান, অন্যদিকে সাধু বাবাজীরা হিংস্র বাঘের মত মুসলমান নারী-পুরুষ-শিশুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করে না। ভারত অধিকৃত কাশ্মীরেও আজকে এই একই কারণে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে বলে মানুষের ধারণা।

মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি, হিন্দুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যখন মুসলমানরা অবিভক্ত ভারতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি তোলে তখন অখণ্ড ভারতের দাবিতে এই হিন্দুরাই মুসলমান মা-শিশুদের মেরে টুকরা টুকরা করে ছুড়ে মেরে বলেছে, এই লও পাকিস্তান। অবিভক্ত ভারতে ১৯৪৬ সালে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছে সে সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ মরহুম আবুল মনসুর, আহমেদ তার 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' নামক গ্রন্থের ১৯৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ও পরবর্তী কয়েকদিন কলিকাতায় যে হৃদয়বিদারক অচিন্তনীয় ও কল্পনাতীত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছিল যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া এমন নৃশংসতা আর কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু মাত্র বিশ বছরের আগের ঘটনা বলিয়া ছয়চল্লিশ সালের চোখের দেখা অমানুষিক নৃশংসতা আজও ঝলমলা মনে আছে। গা কাঁটা দিয়া উঠে। স্বাভাবিক হৃদয়বান ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিবার কথা। ঘটিয়াও ছিল অন্তত একজনের। আমার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আলীপুর কোর্টের এক ব্রাহ্মণ তরুণ মুনসেফ সত্য সত্যই কিছুকালের জন্য মনোবিকার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রিটায়ার্ড জজ ও বয়স্ক উকিল ব্যারিস্টারের মত উচ্চ শিক্ষিত কৃষ্টিবান ভদ্রলোকদিগকে খড়গ রামদা দিয়া তাদের মহল্লার বস্তির মুসলমান নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধাকে হত্যা করিতে দেখিয়াই ঐ তরুণ হাকিমের ভাবালু মনে অমন ধাক্কা লাগিয়াছিল। এটা হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। এই দাঙ্গারও সূত্রপাত হয় ভারতের উগ্রবাদী হিন্দুদের উচ্চ আদালতের আদেশ উপেক্ষা করে বাবরী মসজিদের জায়গায় জোরপূর্বক রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে। ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ ছাড়া সম্পূর্ণ কল্পনার বশবতী হয়ে বাবরী মসজিদের স্থানে রামমন্দির নির্মাণের ইস্যুটি বেশ কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত সানন্দা পত্রিকার এক নিবন্ধে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল। বাবরী মসজিদের সপক্ষে দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও উগ্রবাদী হিন্দুরা তা মানতে নারাজ। তারা ইতিপূর্বে রাজ্য সরকারের মদদে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে, আর এখন সেখানে জোরপূর্বক রামমন্দির নির্মাণের পাঁয়তারা করছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বিজেপি সরকার ঐ একই নীতি গ্রহণ করেছে। মুখে তারা বলছে বাংলাদেশ আমাদের পরম(!) বন্ধু। একদিকে গঙ্গার পানি বন্ধ করে এ দেশের মানুষকে শায়েস্তা করছে, অন্যদিকে বিএসএফকে লেলিয়ে দিয়ে এ দেশের নিরীহ, নিরস্ত্র

মানুষকে পাখির মত হত্যা করছে। ওপার থেকে অস্ত্র পাচার হয়ে এসে আমাদের দেশের আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করছে। ফারাক্কা বাঁধ চালু করে আমাদের দেশকে মরুভূমিতে পরিণত করছে। চোরাচালানের মাধ্যমে আমাদের দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে। সংক্ষেপে এই হচ্ছে বন্ধুত্বের নমুনা।

আমরা ওআইসিসহ সারা মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে গুজরাটের মুসলমান ভাইদের সাথে তাদের একাত্মতা কামনা করছি এবং এই হিন্দু মৌলবাদী সরকারের মদদপুষ্ট উগ্রবাদী হিন্দু সন্ত্রাসীদের এহেন মুসলমান নিধনযজ্ঞের প্রতিবাদে ভারতীয় পণ্য বর্জন, ভারতীয় নাগরিকদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদান বন্ধসহ অন্য সবরকম সাহায্য-সহযোগিতা দান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। সাথে সাথে আমরাও ভারতের এই অসহায় মুসলমান ভাইদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি এবং এই ব্রাহ্মণ্যবাদী উগ্র সন্ত্রাসীদের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারের দাবি জানাচ্ছি। আমরা আশা করব, বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

গুজরাটের ঘটনা চাপা দিতে কাশ্মীর নিয়ে নির্ণায়ক যুদ্ধের হুমকি

ভারতে যতগুলো অঘটন ও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে সেগুলোর প্রত্যেকটির জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবেই দায়ী করা হয় হয়ত পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইকে, নয়ত তথাকথিত মুসলিম জঙ্গীদের। কিন্তু গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য ভারত সরকার ও ক্ষমতাসীন বিজেপি এদের কাউকে দোষারোপ করার ছুঁতা পায়নি। গোধরায় রেলওয়ে কম্পার্টমেন্টে অগ্নিসংযোগের জন্য মুসলমানদের দায়ী করা হয়েছে কোন নিরপেক্ষ তদন্তের বন্দোবস্ত না করেই। কিন্তু এই অজুহাত তৈরির ব্যাপারটা পূর্বপরিকল্পনারই অংশ। করসেবকরা নিম্নবর্ণের হিন্দু। বৈদিক ব্রাহ্মণশাসিত মনুসংহিতার সমাজে তাদের জীবনের মূল্য কিছুই আছে বলে মনে করা হয় না। তাদেরকে সমাজের ভাঁজের মধ্যে রাখতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পৈশাচিক তাণ্ডবে উন্মত্ত করে রাখার একটা প্রয়োজনও থাকে। এতে করে ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙার কাজটাও হয়। পূর্বপরিকল্পিত পরের ঘটনাটা হলেও আগের ঘটনাও ছিল পূর্বপরিকল্পিত। দেশী-বিদেশী প্রতিটি মানবাধিকার সংগঠন এবং কয়েকটি বিদেশী দূতাবাসের নিজস্ব চ্যানেলে পরিচালিত তদন্তে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, গুজরাটে মুসলিম হত্যাকাণ্ড পূর্বপরিকল্পিত এবং এই হত্যাকাণ্ডের জন্য গুজরাটে ক্ষমতাসীন বিজেপি রাজ্য সরকারই দায়ী। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এসব তদন্ত পরিচালনা করা হলে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ ছিল। ভারত সরকার বলতে পারত যে, এসব

রিপোর্টে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকেই এগুলো তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু যেসব দেশ ও সংগঠন তদন্ত পরিচালনা করে তাদের একটিও মুসলিম নয়। ভারত সরকার অন্তত এতটুকু বোঝে যে, কোন অমুসলিম দেশ ও সংগঠনই মুসলমানদের পক্ষ নিতে পারে না। মুসলিম বিরোধিতায় ভারত সরকারের যে মনোভাব প্রতিটি অমুসলিম দেশ ও সংগঠনের মনোভাবও একই। পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকলে বিদেশী শক্তিগুলো ভারত সরকার ও ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষই নিত। কিন্তু সে সুযোগ ছিল না বলে তদন্ত রিপোর্টগুলো মুসলমানদের পক্ষেই গিয়েছে। ২৯ এপ্রিল ২০০২ তারিখে নয়াদিল্লীতে ওয়াশিংটনভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ৭৫ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এ রিপোর্ট পাঠ করেন এই সংগঠনের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক পরিচালক স্মিতা নারুলা। হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচের রিপোর্টে বলা হয় যে, স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষের দেয়া ভোটার তালিকা ও মুসলিম মালিকানাধীন সম্পত্তির খতিয়ান দেখে দেখে উগ্র হিন্দুরা হামলা চালাতে থাকে। এ সময় যেসব পুলিশ কর্মকর্তা ও পুলিশের সদস্যরা মুসলিম নিধনযজ্ঞে সহায়তা দিয়েছে এবং হিন্দু ঘাতকদের হাতে অসহায় মুসলমানদের তুলে দিয়েছে।

ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলোতেও গুজরাটে ভয়াবহ মুসলিম হত্যাকাণ্ডের বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছে। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক সানন্দার ১৫ এপ্রিল সংখ্যার এক রিপোর্টে বলা হয় যে, গুজরাটে মুসলিম নিধনে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস বাণী ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ৮ মাসের ভ্রূণকে মায়ের পেট চিরে বের করে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। এক হিন্দু পুলিশ অফিসার এক মুসলিম মহিলাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় এবং এ মহিলাকে নিরাপত্তা দানের পরিবর্তে দাঙ্গাকারী হিন্দুদের হাতে তুলে দেয়। দাঙ্গাকারীরা এ মহিলাকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। আরেকটি মুসলিম পরিবারের ১৯ জনের সবাই নিহত হয়। এ পরিবারকে প্রথমে পানিতে ডোবানো হয় এবং পানিকে বিদ্যুতায়িত করে তাদের সবাইকে উল্লাস করতে করতে হত্যা করা হয়। বৃটিশ দূতাবাসও তদন্ত চালিয়েছে। বৃটিশ দূতাবাসের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পূর্বপরিকল্পিত এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় এই মুসলিম নিধনযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও অনুরূপ মন্তব্য করেছে। এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল তাকে তদন্ত করতে না দেয়ার জন্য ভারত সরকারের তীব্র সমালোচনা করে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেছে যে, জেনেভা কনভেনশন এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত দলিলে স্বাক্ষরদানকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারত সরকার গুজরাটে মানবাধিকার পরিস্থিতি তদন্ত করতে দেয়নি। এটা ভারতের আন্তর্জাতিক চুক্তি লংঘন।

গুজরাট পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংস্থা ও বিদেশী দেশগুলোর মন্তব্যে ভারত সরকার জর্জরিত হতে থাকে। ভারত বুঝতে পারে যে, গুজরাটে মুসলিম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা চাপা দিতে না পারলে হিন্দু মৌলবাদ ও হিন্দু জঙ্গিদের বীভৎস চেহারা বিশ্বের কাছে উন্মোচিত হয়ে পড়বে। তখন দেখা যাবে যে, মৌলবাদী বলতে যাদেরকে বোঝানো হয় তারা হিন্দু মৌলবাদী ছাড়া আর কেউ নয়। আর সন্ত্রাসবাদী হিসেবে কাউকে চিহ্নিত করতে হলে বিজেপি'র মূল সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংস্থা বা আরএসএস এবং এই সংগঠনের শাখা-প্রশাখাগুলোকেই সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদবিরোধী মার্কিন নেতৃত্বাধীন লড়াইয়ের নল ঘুরানোর আওয়াজ উঠবে এবং ন্যায়নীতি ও নিরপেক্ষতার স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রকে হয়ত সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ে ভারতের হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি সংগঠনগুলোকেও টার্গেট করতে হবে, নয়ত এ লড়াই বন্ধ করে দিতে হবে। গুজরাটে মুসলিম হত্যাকাণ্ডে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারত একটি হিন্দু মৌলবাদী দেশ এবং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ও হিন্দু সংগঠনগুলোই প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসী। কিন্তু ভারতের চাণক্যবাদী সরকার এই সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চায় এবং নিজে সন্ত্রাসী হয়েও মার্কিন নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ের ফসল ভোগ করতে চায়। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে, সন্ত্রাসবাদবিরোধী লড়াইয়ের শুধু আফগানিস্তানের তালেবান কিংবা আল কায়েদাই নয়, কাশ্মীরের মুসলিম স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোও দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই তারা যুক্তরাষ্ট্রের লেজুড়বৃত্তি করছেন এবং নিজেদের শান্তিবাদী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু গুজরাটের ঘটনাবলী তাদের সব আশা মাটি করে দিতে উদ্যত হয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর রিপোর্টে ভারত সরকার শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে যে, এই ঘটনাকে আরেকটি ঘটনা দিয়ে চাপা দিতে না পারলে তার আশায় গুড়েবালি পড়বে। এই উপলব্ধি থেকে ভারত কাশ্মীর কার্ড নিয়ে খেলতে শুরু করে। ছোট্ট একটি ঘটনার অজুহাতে সে প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে নামার পাঁয়তারা করছে। প্রতিদিনই ভারত হুমকি দিচ্ছে যে, কাশ্মীরী মুজাহিদদের দমনে ব্যর্থ হলে সে পাকিস্তান আক্রমণ করবে। ভারতের এই যুদ্ধংদেহী মনোভাব ও প্রতিবেশী পাকিস্তান সীমান্তে সৈন্য মোতায়েনে উস্কানিদানে শান্তিকামী বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। তার এ আচরণকে কেউ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। ভারত যে খোঁড়া যুক্তিতে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধের পাঁয়তারা করছে একই যুক্তিতে প্রতিটি দেশ তাদের নিজ নিজ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে পারে। যদি প্রতিটি দেশ তাই করে তাহলে আগামীকালই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাবে এবং এই মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে, ভারত যা করছে

তেমন আচরণ অন্য কোন দেশ করার চিন্তাও করতে পারে না। প্রতিটি দেশই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই কম-বেশি আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে চলে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের প্রতি ভারত ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধও প্রদর্শন করছে না। যুদ্ধ বেধে গেলে তা যে পারমাণবিক যুদ্ধে রূপ নেবে এবং লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারাবে, সে চিন্তাও তার মাথায় নেই। খুব সহজ-সরল দৃষ্টিতে তাকালেও বোঝা যায়, এ মুহূর্তে ভারতের একটি যুদ্ধের বড় প্রয়োজন এবং এটাও বুঝতে কষ্ট হয় না যে, অভ্যন্তরীণ ইস্যু থেকে সকলের দৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্যই পাকিস্তানের সঙ্গে তার যুদ্ধের এই আয়োজন। বিজেপি নেতৃবৃন্দ খুব কাঁচা নন। তারা যা কিছু করেন খুব ভেবে চিন্তেই করেন। তারা হিসাব করে দেখেছেন যে, গুজরাটে স্মরণকালের ভয়াবহতম মুসলিম হত্যাকাণ্ডকে চাপা দিতে হলে কাশ্মীর ইস্যুকে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা ছাড়া বিকল্প নেই। তাদের উর্বর মস্তিষ্কের দিকনির্দেশনা অনুযায়ীই কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে। এই হামলা এমন এক সময় চালানো হয়, যে সময় দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিনা রোকা নয়াদিল্লী সফর করছিলেন। তার সময় যখন এই ঘটনা ঘটেছে তখন অনুমান করতে বেগ পেতে হয় না যে, তার সফরের সঙ্গে এই হামলার কোন না কোন সম্পর্ক রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, হামলাকারীরা তাকে দেখানোর জন্যই এ হামলা করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হামলাকারী কে? কোন কাশ্মীরী মুজাহিদ সংগঠন, না অন্য কেউ? যে কোন যুক্তিবাদী ব্যক্তিই স্বীকার করবেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য কোন কাশ্মীরী মুজাহিদ সংগঠন এই হামলা চালাতে যেতে পারে না। এই হামলা একমাত্র তারাই চালাতে পারে, যারা কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করছে এবং কাশ্মীরী মুজাহিদদের সন্ত্রাসী হিসেবে প্রমাণ করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। সুতরাং শেষোক্ত যুক্তিতে এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, কাশ্মীরে সেনাঘাঁটিতে কথিত হামলার জন্য ভারত ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। এই ঘটনায় ভারত ছাড়া আর কারও লাভবান হওয়ার সুযোগ নেই। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কাশ্মীরী মুজাহিদরা মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নয়াদিল্লী সফরকালে নারী ও শিশুদের ওপর হামলা চালিয়ে নিজেদের কলঙ্কিত করে ভারত সরকারকে অপপ্রচার চালানোর সুযোগ দিতে পারে না। ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে যে, কাশ্মীরে সেনাঘাঁটিতে হামলাটি সুপরিকল্পিত এবং পেছনে কারও অদৃশ্য হাত রয়েছে।

একটি বিষয় খুবই রহস্যময় যে, কাশ্মীরে সেনাঘাঁটিতে হামলাকারী তিনজনের প্রত্যেকেই নিহত হয়েছে। ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলাকারী ছয় জন বন্দুকধারীর প্রত্যেকেই একইভাবে নিহত হয়। হামলাকারীদের একজনও জীবিত

থাকবে না অথবা তাদের কেউ পালিয়ে যেতে পারবে না, তা তো হতে পারে না। এখানেই রহস্য এবং এ রহস্যের জট খুলতে পারলেই হামলাকারীদের চেহারা ধরা পড়ে যাবে। বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে তাকালে এ জট খোলাও অসম্ভব নয়। ভারতের সংশ্লিষ্টতার প্রশ্ন জড়িত বলেই হামলাকারীদের কেউ বেঁচে নেই। এদের কেউ জীবিত থাকলে কোন না কোনভাবে অথবা কোন না কোনদিন একথা প্রকাশ হয়ে পড়ত যে, ২২ ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে লোকসভা ভবনে হামলা এবং পরবর্তীকালে ১৪ মে শ্রীনগরে ভারতীয় সেনাঘাঁটিতে নারী ও শিশুদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারই দায়ী।

দুনিয়ার কোন কথাই গোপন থাকে না। ভারতের চক্রান্তও গোপন নেই। এক খবরে জানা গেছে যে, আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের পতনের পর কয়েকশ' পাকিস্তানী ভলান্টিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় জোটের হাতে বন্দি হয়। উত্তরাঞ্চলীয় জোট এসব বন্দি পাকিস্তানীকে একটি অংশকে ভারতের হাতে হস্তান্তর করে। ভারত তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে সহায়তাদানের বিনিময়ে ভারত এসব পাকিস্তানী বন্দিকে বোনাস হিসেবে লাভ করে। ভারত এসব বন্দিকে মুক্তিদানের প্রলোভন দিয়ে তাদেরকে তার রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। বন্দিরা মুক্তিলাভের আশায় ভারতের পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছে এবং পাখির মত মারা পড়ছে। নিহত এসব হতভাগ্যের লাশ দেখিয়ে ভারত প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, এরা অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানী জঙ্গি এবং পাকিস্তান এদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে হামলা করার জন্য ভারতে পাঠিয়েছে।

আমরা একথা বলছি না যে, কাশ্মীরী মুজাহিদরা সামরিক তৎপরতায় নিয়োজিত নয়। কাশ্মীরী মুজাহিদরাও সামরিক অপারেশন চালায়। তবে সেগুলো যৌক্তিক এবং কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামের জন্য খুবই সহায়ক। কিন্তু ভারত কাশ্মীরী মুজাহিদদের সশস্ত্র সংগ্রামকে 'সন্ত্রাসবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করতে এবং অপপ্রচার চালাতে এমন কিছু পরিকল্পিত সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটায়, যেগুলো থেকে কাশ্মীরী মুজাহিদদের তৎপরতাকে আলাদা করা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিকল্পিত ঘটনাগুলোই বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে এবং কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্ব বিবেকও এত ভোঁতা হয়ে গেছে যে, ভারত যা বলছে তাই বিশ্বাস করছে। কিন্তু একটি দেশও বলছে না যে, কথিত আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস অথবা পাকিস্তানের সমর্থন ও সহানুভূতি কাশ্মীর সমস্যার মূল কারণ নয়, মূল সমস্যা হচ্ছে কাশ্মীরী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে অস্বীকার করা এবং জাতিসংঘ প্রস্তাব অনুযায়ী গণভোট অনুষ্ঠানে ভারতের অস্বীকৃতি।

কাশ্মীর সমস্যার জন্য ভারত যতটুকু দায়ী বিশ্ব সম্প্রদায়ের দায়দায়িত্ব তার চেয়ে মোটেও কম নয়। একটি দেশ তার নিজের স্বার্থে ভুল করতে পারে। কিন্তু গোটা মানব জাতি তো সে ভুলের স্বীকৃতি দিতে পারে না। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আজকের বিশ্বসভ্যতা তাই করছে। প্রায় প্রতিটি দেশই কথিত আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাস বন্ধের জন্য পাকিস্তানকে চাপ দিচ্ছে। কিন্তু একটি দেশও কাশ্মীরীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার মেনে নেয়ার জন্য ভারতকে চাপ দিচ্ছে না। সবার চোখে কেবল কাশ্মীরে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসই ধরা পড়ছে। ধরা পড়ছে না শুধু কাশ্মীরীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। স্বাধীনতা সংগ্রাম অন্যায় হলে এই অন্যায় প্রতিটি জাতিই কোন না কোন সময় করেছে। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে যে, কাশ্মীরীরা আজকে যে পথে এবং যে প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে খোদ ভারত ও যুক্তরাষ্টও একই প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতা অর্জনে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কাশ্মীরী মুজাহিদরা সন্ত্রাসী হলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ নেতাজী সুভাষ বসুকে কি বলতে হবে? যে ক্ষুদিরামের ফাঁসির জন্য আমাদের চোখে পানি আসে তিনি কোন নামে পরিচিত হবেন? এটাই বাস্তবতা যে, দখলদার শক্তির দৃষ্টিতে বরাবরই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু যারা দখলদার নয় তাদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচিত হবে কেন? ভারত হচ্ছে কাশ্মীরে দখলদার শক্তি। তার দৃষ্টিতে কাশ্মীরী মুজাহিদরা 'সন্ত্রাসী' বলে চিহ্নিত হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য দেশগুলোর বিচারে এমন অন্যায় হচ্ছে কেন? তবে কি আমরা এ কথা বলব যে, পৃথিবীতে আর কোন স্বাধীনতা সংগ্রাম হবে না এবং আর কারও স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়োজন নেই? যতদিন মানব সভ্যতা থাকবে ততদিন মানচিত্রে রদবদল ঘটবেই। এক হিসাবে বলা হয়েছে যে, আগামী একশ' বছর পর পৃথিবীতে রাষ্ট্রের সংখ্যা হবে অন্তত চারশ'। এই ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হলে নতুন নতুন দেশগুলো জন্ম নেবে কিভাবে?

আমাদের চোখের সামনেই আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে নতুন দেশের জন্ম হয়। গত ২০ মে কনিষ্ঠতম রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব তিমুরের জন্ম হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা এখানেই থেমে যাবে এমন চিন্তা করার কোন কারণ নেই। আরও বহু দেশের জন্ম-মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হয় কেবল মুসলিম পরিচিতি থাকলে। কাশ্মীর মুসলিম প্রধান না হয়ে খ্রিস্টান প্রধান হলে পাশ্চাত্য কি এখানে ভারতের দখলদারিত্ব মেনে নিত? অথবা তাদের দৃষ্টিতে কি এখানে সন্ত্রাসবাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ত? যত দোষ নন্দ ঘোষ। মুসলমান হলেই যত আপদ। মুসলমানরাই 'সন্ত্রাসী' তারাই কেবল মৌলবাদী।

ভারতে হিন্দু মৌলবাদী বিজেপি সরকার ক্ষমতায়। এই সরকারের সঙ্গে পাশ্চাত্যের লেনদেনে কোন সমস্যা হয় না। ভারতকে কেউ মৌলবাদী দেশ বলে গালিও দেয় না। শুধু কি তাই? হিন্দু মৌলবাদীরা মুসলমানদের জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারলেও তারা সন্ত্রাসী বলে বিবেচিত হয় না। বিজেপির মূল সংগঠন আরএসএস-এর হাজার হাজার সদস্য বড় বড় শহরে, গ্রামেগঞ্জে সামরিক কুচকাওয়াজ করলে সেদিকে কারও খেয়াল যায় না। ভারতে আরএসএস ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলো যা করছে কোন মুসলিম দেশে কোন ইসলামী সংগঠন কি সে ধরনের জঙ্গি তৎপরতা চালাতে পারত, না তেমর নজির পৃথিবীর কোথাও আদৌ আছে? বিগত লোকসভা নির্বাচনে আরএসএস-এর ১০ লাখ সদস্যের একটি আধাসামরিক বাহিনী বিজেপি'র পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেছে। এই ধর্মীয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সদস্যরা খাকি হাফপ্যান্ট, গায়ে স্যান্ডু গেঞ্জি ও হাতে দস্তানা পরিধান করে। দস্তানা পরিহিত ছাড়াও আরএসএস-এর সদস্য রয়েছে। তবে যারা হাতে দস্তানা পরিধান করে এমন সব সদস্যকে নিয়েই গঠিত হয়েছে ১ লাখ ২৫ হাজার শাখা। ছাত্রদের মধ্যে রয়েছে ১৫ লাখ দস্তানাধারী সদস্য এবং কৃষকদের মধ্যে ১৫ লাখ। ১৯২৫ সালে ডঃ কেশব রাও হেডগেওয়ারের হাতে এই সংগঠনের জন্ম। বিজয় দিশমীর দিনে নাগপুরে এ সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। জন্মলগ্নে আরএসএস সদস্যদের ধ্যান শেখানো হত। কিন্তু পরে একটি হিটলারের নাৎসী দলের কায়দায় একটি আধাসামরিক বাহিনী হিসেবে গড়ে ওঠে। ভারতে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠাই এই সংগঠনের লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী আরএসএস-এর আজীবন সদস্য। আদভানী, মনোহর যোশী, কল্যাণ সিংহ, প্রমোদ মহাজন, বিনয় কাতিয়ার, সুষমা স্বরাজও আরএসএ-এর লোক। দলটির উত্থান খুবই চমকপ্রদ। প্রথমে আরএসএস-এর বিশিষ্ট কয়েকজন লোক জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু মহাসভার ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ছিলেন এ দলের প্রতিষ্ঠাতা। এরপর হাল ধরেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী। ১৯৭৭ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের জোটে যোগ দিয়ে জনসংঘ খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মোরারজী দেশাইয়ের সরকারে বাজপেয়ী হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। জনতা দলের নেতৃত্বাধীন সরকারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েও সাপ্তাহিক ধর্মালোচনায় যোগ দিতে থাকেন। এ নিয়ে গোলমাল শুরু হলে জনসংঘ জনতা দলের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৮০ সালে জনসংঘের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বিজেপি। বিজেপি ক্ষমতায় থাকলেও চাবিকাঠি রয়েছে আরএসএস-এর হাতে। তাই বিজেপি সরকারের প্রতিটি সদস্য আরএসএস-এর মন যুগিয়ে চলেন। বাজপেয়ীজী নিজেও কম যান না। তিনি তার এক কবিতায় বলেছেন, হিন্দু হিন্দু, মেরা পরিচয়। অর্থাৎ হিন্দুত্বই আমার একমাত্র পরিচয়। তিনি সত্যি কথাই বলেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে হিন্দুত্বে বিশ্বাসী। একই বিশ্বাসের অংশীদার

প্রতিটি হিন্দু। ভারত নামটিও হিন্দু পরিচয় বহন করে। রাজা ভারতের নামানুসারে দেশের নাম রাখা হয়েছে ভারত। এখানে শুধু হিন্দুরাই বসবাস করবে, মুসলমানরা নয়। তাই শুরু হয়েছে মুসলিম নিধন। গুজরাট থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য কাশ্মীর সংকট খাড়া করা হয়েছে। পানি ঘোলা করা হবে কাশ্মীরে, কিন্তু মাছ শিকার হবে অন্যত্র। এই হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি'র রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার কৌশল।

উদ্ধৃতি ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ৮ জুন ২০০২ ॥ সাহাদত হোসেন খান।

দক্ষিণ এশিয়ার নতুন রাজনৈতিক সংকট ভারতের উগ্র হিন্দু মৌলবাদ

বাঙালি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, গত আড়াইশ' বছর ধরে তাদের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ঘুরপাক খেয়ে ফিরেছে প্রতিবেশের প্রভাব, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, আশা আর কল্পনার জগতে। ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রের অর্থ, মেধা ও শিক্ষার অবনতি, অতিরিক্ত ভাবাবেগ ও উদার মনোবৃত্তি, হিন্দু নেতৃবৃন্দের কৃত্রিম ব্যক্তিত্বের প্রবল প্রভাব প্রভৃতি কারণে সমকালে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ভুল ভাষ্য ও ভবিষ্যদ্বাণী রচনা করে বাস্তব থেকে বারবার দূরে সরে গেছে এ দেশের মুসলমান।

এ জন্যই ১৭৫৭ সালে দেশীয় শাসনের পতনের মাধ্যমে সূচিত দীর্ঘ পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ গতিবিধি তারা আন্দাজ করতে পারেনি, উনিশ শতকে বঙ্কিম প্রমুখের দ্বারা পরিচালিত বাংলার রেনেসাঁর নামে গোঁড়া হিন্দুত্ববাদের জাগরণ ও তার ফলাফল উপলব্ধি করতে পারেনি, বিশ শতকে স্বাধীন বাংলা বা পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রগতিশীল বলে খ্যাত হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রচণ্ড বিরোধিতার উৎস ও অর্থও তারা বুঝতে পারেনি; ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট ভারতের এসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে নেহরু যখন ভারতকে অসাম্প্রদায়িক দেশ বলে ঘোষণা করলেন তখনো তারা অনুসন্ধান করে দেখেনি যে, এই নেহেরু সারাটি দিন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বাড়িতে উগ্র মৌলবাদী হিন্দু পুরোহিতদের সাথে কাটিয়ে তাদের আর্শীবাদ আর পবিত্র অগ্নির ভস্ম কপালে পরে নিজেকে অসাম্প্রদায়িক দাবি করতে এসেছেন। বাঙালি মুসলমান প্রতিবার প্রতারিত হয়েছে এবং প্রতারিত করেছে নিজেকেই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

এমনকি এই কয়েক বছর আগে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হওয়ায় এ দেশে কয়েকজন আমলা বুদ্ধিজীবী পত্রিকায় কলাম লিখে চাপা আনন্দ ও মত ব্যক্ত করেছিলেন যে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা। অথচ এই বিজেপির নেতৃত্বেই বাবরী

মসজিদ শহীদ করা হয়েছিল। মসজিদ ভাঙ্গার সময় অনেক নেতৃবৃন্দের সাথে আদভানীও ঘটনাস্থলে অদূরে চেয়ারে বসে মসজিদ ধ্বংসের কাজে প্রয়োজনীয় নির্দেশন দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাদের দাদা বড় দাদাদের মত ওইসব আমলা বুদ্ধিজীবীরাও কি এক অজ্ঞাত অন্ধত্বের কারণে বুঝতে পারেননি ভারতে বিজেপিসহ অন্য উগ্র হিন্দু মৌলবাদী দলগুলোর উত্থান শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশয়িার জন্য অতি দ্রুত এক গভীর ও দীর্ঘমেয়াদি ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করবে। এখন এই মুহূর্তে তা কোন আশঙ্কা নয়, ভারতের বর্তমান মৌলবাদী উগ্রমূর্তি ভয়ঙ্কর এক সংক্রামক বাস্তব মাত্র।

ভারতের বর্তমান সাম্প্রদায়িক সংকটের শুরু কংগ্রেসের মাধ্যমে। সত্তরের দশক পর্যন্ত উগ্র হিন্দু মৌলবাদী দলগুলো বেশ কোণঠাসা ছিল। কিন্তু কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করলে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ডানপন্থী সাম্প্রদায়িক দলগুলোর আশ্রয় নেন। পরবর্তী সময়ে একই কারণে রাজীব গান্ধীও সাম্প্রদায়িক দলগুলোর উগ্র কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেননি; বরং মৌলবাদী হিন্দুদের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য প্রতি সপ্তাহে ঘটা করে পূজোয় যেতেন। কংগ্রেসের নীরব মৌন প্রশ্রয়ে সত্তরের দশকেই হিন্দু মহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, শিবসেনা প্রভৃতি উগ্র মৌলবাদী দলের নেতৃবৃন্দের একটা অংশ মিলে জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭৭ সালে জনতা দলের সরকারে জনসংঘের সমর্থন ছিল। ক্ষমতায় থেকে জনসংঘ নতুন শক্তি ও পুষ্টি নিয়ে ১৯৮০ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নামে আত্মপ্রকাশ করে। পার্টির ম্যানিফেস্টোতেই ঘোষণা করা হয় সমগ্র ভারতে হিন্দু শাসন ও সংস্কৃতি কায়েম করা হবে।

হিন্দু ধর্মের জয় ঘোষণা করে ভারতের উগ্র হিন্দু জনতার ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে দলটি ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। আশির দশকের শেষদিকে ভিপি সিংয়ের নেতৃত্বে জনতা দল অন্যান্য দলসহ বিজেপির সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসে। এ সময় ভিপি সিং দৃঢ়চিত্তে বিজেপির বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রচেষ্টা বানচাল করে দেন। সেই সাথে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বিভিন্ন বাড়তি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগে নিলে বিজেপির সাথে আরেক প্রস্ত সংঘাত বাধে। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গায় বাধাদান এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বাড়তি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ নেয়ায় বিজেপি সমর্থন প্রত্যাহার করলে জনতা দল সরকারের পতন ঘটে। কিন্তু ১৯৭৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়পর্বে উগ্র হিন্দু জনসাধারণের আবেগে উস্কানি দিয়ে বিরাট জনসমর্থন পেয়ে বিজেপি প্রধানতম রাজনৈতিক দল হিসেবে তার ভিত প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়।

এরপর ১৯৯২ সালে কংগ্রেস সরকারের নীরব সমর্থনে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে এবং বোম্বেসহ সারাদেশ মুসলিম হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বিজেপি সারা ভারতের উগ্র হিন্দুদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গত সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় আসা এসব ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের হিন্দু জনগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক আবেগ ও উগ্রতার একটা ছদ্মবেশ ছিল। বিজেপি তা পরিহার করে স্বরূপে আর্বিভূত হয় এবং খুব দ্রুত তার সাম্প্রদায়িক প্রবণতাগুলো আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ছড়িয়ে দিতে থাকে, যা ক্রমশ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে বড় ধরনের সংকটের রূপ নিচ্ছে। এখানে মনে রাখা দরকার, ভারতে উগ্র হিন্দু মৌলবাদী দলগুলোর উত্থান কাকতালীয়ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনজনিত এক মেরুর আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং পশ্চিম জোটের ইসলামবিরোধী তৎপরতার সাথে সময়ানুক্রমিক। সুতরাং এদের পারস্পরিক সম্পর্কও খুঁজে দেখা উচিত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর থেকে ভারতের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে থাকে, পাকিস্তান-মার্কিন সম্পর্কে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। অন্যদিকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন হামলা ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। বিভিন্ন দেশে ক্রমশ স্বাধীনচেতা হয়ে ওঠা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আমেরিকা তার একনায়ক হওয়ার পথে শক্তিশালী বাধা বলে মনে করে। ভারতের সাথে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক এমনকি সামরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পেছনে মার্কিন নীতি-নির্ধারকদের বিবেচনায় শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়ার কথা। তেমনি ভারতের উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রবণতাও পাকিস্তানকে চিরশত্রু মনে করে এসেছে। অর্থাৎ ভারত এবং আমেরিকা উভয় দেশই পাকিস্তানকে বিবেচ্য প্রতিপক্ষ মনে করেই পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার গুরুত্ব অনুধাবন করেছে। সুতরাং দুই দেশের উদ্দেশ্যের পেছনেই ইসলাম এবং মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রধান বিষয়। কিন্তু আমেরিকার সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠ সামরিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক শুধু পাকিস্তানকেই প্রভাবিত করছে না, ভারতকে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে। অর্থাৎ বিজেপি ক্ষমতায় আসায় তাদের উগ্র মুসলিমবিদ্বেষের কারণে গড়ে ওঠা নতুন ভারত-মার্কিন দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বিপর্যস্ত করেছে।

বিজেপির উত্থান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরেকটি বিপজ্জনক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তা হল ভারত ইসরাইল সম্পর্কে ব্যাপক পরিবর্তন। ইসরাইলের সাথে ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক বরাবরই ভাল ছিল। কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় আসায় তা সামরিক ও কৌশলগত ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়ে নতুন মাত্রা ও নৈকট্য লাভ করেছে। দিল্লী-বোম্বের পর কলিকাতায় এফবিআইর সাথে

সাথে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাডও অফিস খুলেছে বলে শোনা যাচ্ছে। গুপ্তহত্যা, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, অন্য দেশে গোপনে হামলা প্রভৃতি কাজে মোসাডের উপস্থিতি প্রতিবেশী দেশগুলোর ক্ষেত্রে তো বটেই, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার জন্যই আশঙ্কাস্বরূপ। নিজ স্বার্থ বা ভারতের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মোসাড প্রয়োজনে যা খুশি তাই করতে পারে।

ইসরাইল ও ভারতের সম্পর্কের সাম্প্রতিক ঘনিষ্ঠতাও মূলত বিজেপি সরকারের মুসলিমবিদ্বেষের ফল। উভয় দেশ ইসলামকে শত্রু মনে করে বলেই তাদের সম্পর্ক দিন দিন ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। ভারতের মুসলিম বিদ্বেষ আগেও বিভিন্ন উপলক্ষে প্রকাশ্য রূপ লাভ করেছে। আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করার সময় ভারত আগবাড়িয়ে তার স্থল ও জলবন্দর ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছিল। ইসরাইল কারগিল যুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যুদ্ধ সরঞ্জাম বিক্রির মাধ্যমে ভারতকে সহায়তা করে। ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারে হামলা পৃথিবীর রাজনৈতিক বিন্যাসকেই পাল্টে দিয়েছে। কয়েকটি পত্রিকায় টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনাকে পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যমূলক কাণ্ড বলে অভিহিত করে এর সাথে দু'একটি দেশের জড়িত থাকার সম্ভাবনা ও সম্পূরক যুক্তি তুলে ধরা হয়েছিল। আমেরিকাও এখন পর্যন্ত পরিষ্কার করে বলেনি যে, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কিভাবে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল। এ জন্য অনেকের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হচ্ছে। কয়েকদিন আগে আমেরিকায় পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায়, সাধারণ আমেরিকানরা মনে করে টুইন টাওয়ার ঘটনার ব্যাপারে বুশ প্রশাসন কিছু একটা গোপন করছে, যা জানার অধিকার রয়েছে সাধারণ নাগরিকদের। এসব ফ্যাক্টর ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করলে মনে হয়, তৃতীয় পক্ষের অংশগ্রহণ ছাড়া টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়নি। তা হলে কে বা কারা তা করে থাকতে পারে? এ ক্ষেত্রে ভেবে দেখা প্রয়োজন, এ ঘটনায় উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে কোন কোন দেশ স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেছে। প্রথমেই আসে ইসরাইলের নাম। আফগানিস্তানে হামলা চলাকালে ইসরাইল আকস্মিকভাবে ফিলিস্তিনে ব্যাপক সামরিক হামলা চালিয়ে প্রায় সমগ্র ফিলিস্তিন আবার তার দখলে নিয়ে গেছে। সেখানে যা ঘটেছে তাকে পরিকল্পিত মুসলিম গণহত্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনীদের মুসলিম সন্ত্রাসী অভিহিত করে এ রকম নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালানো সম্ভব হয়েছে আমেরিকার মুসলিমবিরোধী প্রকাশ্য অবস্থানের ফলে। ইসরাইল একবার ১৯৬৭ সালেও গোপনে একটি মার্কিন জাহাজ ধ্বংস করে তার দায় ইসলামী দেশগুলোর ওপর ফেলে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আমেরিকাকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করতে চেয়েছিল। সুতরাং বিবেকশূন্য ইসরাইলীদের পক্ষেই সম্ভব পরোক্ষ মদদ দিয়ে ভয়াবহ টুইন টাওয়ার ট্র্যাজেডি ঘটিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া। তার যথাযথ ফায়দা তারা তুলে নিয়েছে।

টুইন টাওয়ার ধ্বংসের সাথে ইসরাইলীদের জড়িত থাকার নির্দিষ্ট কারণ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র পাকিস্তানই পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী, যারা টুইন টাওয়ারে হামলার পরপর সিএনএন টেলিভিশনে সাবেক ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাকের সাক্ষাৎকার দেখেছেন। তাদের মনে থাকার কথা যে, নিষ্ঠুরতার জন্য সাবেক প্রাক্তন জেনারেল এহুদ বারাক ঘটনার সাথে পাকিস্তানকে জড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং পরোক্ষ প্রস্তাব দিচ্ছিলেন, তখনই পাকিস্তান আক্রমণ করে তার পারমাণবিক অস্ত্রগুলো ধ্বংস করে ফেলা উচিত। মূলত এটিই হল ইসরাইলের এবং ভারতের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা। এর আগেও ইসরাইল এ ধরনের কাজ করেছে। ১৯৮০-এর দশকে এক ভোরে আকস্মিকভাবে হামলা চালিয়ে ইরাকের পারমাণবিক স্থাপনা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল ইসরাইলী বাহিনী। এবারও হয়তো তেমই চেয়েছিল ইসরাইল। অতএব তাদের সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুকূল সংকট সৃষ্টির জন্য টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের হাত থাকাটা খুবই স্বাভাবিক।

অনেকেই মনে করেন মোশাররফের চতুর সুচিন্তিত ও সময়ানুযোগী পদক্ষেপ গোটা পরিকল্পনাটি নস্যাৎ করে দেয়, ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয় পাকিস্তানকে। পাকিস্তান যদি আফগান হামলায় আমেরিকাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করত, তাহলেই পাকিস্তানে হামলা হতো এবং যেভাবেই হোক দেশটির পারমাণবিক স্থাপনাসহ পারমাণবিক অস্ত্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রসম্ভার ধ্বংস করে দেয়া হতো। এটা সহজে অনুমেয় যে মোশাররফ ইসরাইল ও ভারতের মিলিত পরিকল্পনার পূর্বাভাস পেয়ে আমেরিকার ইচ্ছার কাছে পুরোপুরি সমর্থন করেন। ফলে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। এতে সমস্যার সমাধান হয়েছে মাত্র। কারণ আমেরিকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, ইসরাইল তার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসব হচ্ছে। সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় বুশের জনসমর্থন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। কয়েকদিন পূর্বে আমেরিকার ইহুদী লবি তথ্য প্রকাশ করেছে যে, সিআইএ ১১ সেপ্টেম্বরের পূর্বেই বিমান হাইজ্যাক এবং তা দিয়ে এ ধরনের হামলার কথা বুশকে জানিয়েছিল। জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, এ তথ্য পাওয়ার পরও বুশ কেন কোন পদক্ষেপ নেননি। তাই বুশের সমর্থনও দ্রুত কমছে।

বুশের জনসমর্থন হ্রাসের পেছনে মূল কারণ হল, সম্প্রতি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে বুশের দৃঢ়মত ব্যক্ত করা। এর ফলে মার্কিন ইহুদী লবি বুশকে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নেয়। উপরোক্ত ঘটনা তার শুরু মাত্র। বুশের পতন না হওয়া পর্যন্ত তারা থামবে না। অতীতের অভিজ্ঞতা তাই বলে। ফিলিস্তিনীদের সংগ্রামে সমর্থন করতে গিয়ে আরও দু'জন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। এরপরও কার্টার চেষ্টা করেছিলেন ফিলিস্তিন সংকটের স্থায়ী সমাধান;

অর্থাৎ স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ফল হিসেবে কার্টার ক্ষমতা হারান। সিনিয়র বুশ ক্ষমতায় থাকাকালে ইসরাইল আমেরিকার কাছে ১০ বিলিয়ন ডলার ঋণ চাইলে বুশ শর্ত জুড়ে দেন যে, ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংকটের স্থায়ী সমাধান হলে তিনি ঋণের ব্যবস্থা করবেন। আমরা দেখেছি পরের বার নির্বাচনে বুশ পরাজিত হন। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণায় সমর্থন করার একই পরিণতি হতে পারে জুনিয়র বুশেরও। অর্থাৎ ইসরাইল, ভারত ও আমেরিকা এই মুহূর্তে যে অবস্থান গ্রহণ করেছে তা হঠাৎ করে পরিবর্তিত হওয়ার জোর সম্ভাবনা নেই, যদি না মুসলিম দেশগুলো মিলিতভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে; তবে সে ধরনের সাফল্যের ইতিহাস আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র কমিউনিটির নেই। তারা বরং আত্মকলহেই অধিক অভ্যস্ত। এবার আসা যাক ভারত প্রসঙ্গ। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পর পর ভারত আকস্মিকভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সহযোগিতায় অভিযোগ তুলে পাকিস্তান আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। এ ঘটনায় আমেরিকা ভারতকে পরিষ্কার ভাষায় রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে, ছোটখাটো সামরিক সহযোগিতার ইঙ্গিতও দিয়েছে। সুতরাং এখানেও ইসরাইলের সাথে একযোগে কাজ করে ভারত পরিকল্পিতভাবে টুইন টাওয়ার সংকট ঘটিয়ে বর্তমান সুবিধাজনক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে বলে সন্দেহ করা অমূলক নয়। এক্ষেত্রেও প্রধানতম সক্রিয় উপাদান হিসেবে আছে বিজেপি সরকারের অন্ধ মুসলিমবিদ্বেষ উগ্র মৌলবাদী আবেগ।

ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটানোয় পাকিস্তানও তার সেনাবাহিনী পাঠাতে বাধ্য হয়েছে। দু'দেশের কাছেই আছে পরামাণবিক অস্ত্র। বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্য আশঙ্কাজনক। পরিস্থিতির আরেকটি বিপজ্জনক দিক হল, ভারতের সাধারণ নিরীহ মুসলমানদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। গুজরাটে রাজ্য সরকারের সহায়তার চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে দিনের পর দিন মুসলমানদের পুড়িয়ে মারছে মৌলবাদী হিন্দুরা। এরই মধ্যে দু'হাজারেরও বেশি মুসলমান হিন্দুদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্পদ হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়েছে এক লাখ মুসলমান। গুজরাটে এখনও প্রতিদিন মুসলমানরা খুন হচ্ছে। অথচ সেখানে সরকার আছে, পুলিশ আছে, মিলিটারী আছে, আছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফিলিস্তিনে ইহুদীদের মুসলিম গণহত্যার সাথে গুজরাটের হত্যাকাণ্ডের কোন পার্থক্য নেই; বরং রহস্যময় কারণে সবগুলো আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে গুজরাটের গণহত্যা ঠিকমত প্রচারিত হচ্ছে না। আমাদের দেশেও পত্র-পত্রিকার অনেকগুলোই হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। তার অবশ্য কারণ আছে, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। গুজরাট ট্যাজেডি একটি সংকেত বা হুঁশিয়ারি। আমরা যদি এ সংকেত পড়তে জানি তাহলে অনেকটাই নির্ভুল আন্দাজ করতে

পারব, এরপর কি ঘটবে। এরপরের আক্রমণ আসবে কাশ্মীরের ওপর, ফিলিস্তিনে, ইহুদীদের পরিচালিত মুসলিম গণহত্যার মত। ভারতের সরকার প্রথম প্রচারণা চালাবে যে, কাশ্মীরে মৌলবাদীরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে এবং তাতে অংশগ্রহণ করছে পাকিস্তান থেকে আসা মুসলিম সন্ত্রাসীরা। অতঃপর ফিলিস্তিনের মত কাশ্মীরেও নিরীহ মুসলমানদের ওপর ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান, ক্ষেপণাস্ত্রের মত অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে ভারতীয় সেনাবাহিনী। দিনের পর দিন মুসলমানদের হত্যা করা হবে যে পর্যন্ত না স্বাধীন কাশ্মীরের পক্ষের শেষ কাশ্মীরীটিও খুন না হয় কিংবা দেশত্যাগ না করে। এ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে ভারতের পরিবর্তিত অবস্থান সৃষ্টি করেছে আরেকটি সংকটজনক পরিস্থিতি। ব্রিটেন আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলো পারস্পরিক স্বার্থের প্রশ্নে আর্থ-সামরিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত একযোগে কাজ করছে। ন্যাটোর সাথে সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নও পুরোপুরি সক্রিয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দু'জন আলোচক এসেছেন দিল্লীতে ভারত-পাকিস্তান সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য। তাদের একজন ক্রিস প্যাটেন। তিনি এসেই প্রথম টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, ভারত তার ধৈর্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে। তার ভাষায় মোশাররফ সাহেব ভাল ভাল বক্তৃতা করেছেন; শুধু বক্তৃতা দিলে চলবে না, কাজ দেখাতে হবে। কাশ্মীরে পাকিস্তানী মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা এসে হামলা চালাচ্ছে, তাদের ধ্বংস করতে হবে। ক্রিস প্যাটেনের সাক্ষাৎকারে সংকটের মূল অর্থাৎ কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে কোন কথা নেই। তিনি বলেননি কেন ভারত পঞ্চাশ বছর ধরে জাতিসংঘের রেজুলেশনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে জোর করে কাশ্মীর দখল করে রেখেছে। তিনি বলেননি, কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম ধ্বংসের জন্য পাকিস্তান কি করতে পারে। তিনি কি চান পাকিস্তান ভারতের ভাড়াটে গুণ্ডা হিসেবে কাশ্মীরের মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক? সংকট সমাধানের আলোচক হিসেবে যিনি এসেছেন তার এ ধরনের একপার্শ্বিক মনোভাব কেন? এজন্য জানা দরকার ক্রিস প্যাটেনের পেছনের কথা।

ক্রিস প্যাটেন হংকং-এর শেষ ব্রিটিশ গভর্নর। আধুনিক জামানায় শেষ ঔপনিবেশিক কায়দায় ব্রিটিশ উপনিবেশ হংকংকে শাসন করতেন এই ক্রিস প্যাটেন। স্বাভাবিক কারণেই তার মনোভাবও ঔপনিবেশিক আগ্রাসী প্রবণতায় প্রভাবিত, যার প্রধান লক্ষণ হল শক্তির বিচারে কথা বলা। বিভিন্ন দেশের সহাবস্থান ও স্বাধীনতার চেয়ে জোরজবরদস্তি ও নিঃশর্ত বশ্যতার প্রতিই তার আগ্রহ বেশি থাকার কথা। উপনিবেশ শাসন মানে তাই। তার বক্তব্যেও সে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাই ক্রিস প্যাটেনের কাছে ভারত কর্তৃক কাশ্মীর দখল

করে রাখার বিষয়টি হয়তো সঠিক বলেই মনে হয়েছে। আলোচনার জন্য আসা দ্বিতীয় ব্যক্তিটির নাম জ্যাক স্ট্র। উনি টনি ব্লেয়ারের হোম সেক্রেটারী ছিলেন অনেক দিন। এখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ভারত-পাকিস্তান সংকট নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তার একটি মৌলিক পরিচয় তুলে ধরা দরকার। তা হল তিনি একজন ইহুদী। পরিষ্কার বোঝাই যায়, একজন ইহুদীকে কেন আলোচনার জন্য পাঠান হল। অর্থাৎ আলোচক হিসেবে ঔপনিবেশিক শাসক ক্রিস প্যাটেন এবং কট্টর ইহুদী জ্যাক স্ট্র-এর উপস্থিতি প্রমাণ করে, ইউরোপীয় ইউনিয়নও ভারতের প্রতি তার সমর্থন পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। এতে আমেরিকার একনায়কত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাধা হিসেবে কাজ করবে বলে আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল তার অবসানও ঘটল।

কমিউনিস্ট ব্লক ভেঙ্গে যাওয়ার পর অনেকে আশা করেছিলেন, রুশ-ভারত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, চীনের মার্কিনবিরোধী অবস্থান এবং ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে সম্ভাব্য নতুন ঐক্যশক্তির ভারসাম্য ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। ভারতের নীতি পরিবর্তনের কারণে সে সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত; বরং আমেরিকা ভারতের প্রতি সাহায্যের যে উদার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তা ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার ইসরাইলে পরিণত করবে। এখন থেকে আমেরিকা দক্ষিণ এশিয়ায় তার স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতকে ব্যবহার করার সম্ভাবনাই প্রবল। সে ক্ষেত্রে ভারতের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্যও তাকে দিতে হবে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ এমনকি ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ভারতের আগ্রাসী ছায়া বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে যায় না। এ সমস্ত কিছুর জন্যই দায়ী বিজেপি এবং শরীক দলগুলোর মুসলিমবিদ্বেষী ও মৌলবাদী মনোভাব।

মার্কিন উপস্থিতি এবং ভারতের নতুন সাম্রাজ্যবাদী অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় যে সংকট ঘনীভূত করছে তার পেছনে উগ্র হিন্দু দলগুলোর মৌলবাদী মনোভাব তথা অন্ধ মুসলিমবিদ্বেষ প্রধান নিয়ামক হিসেবে সক্রিয়। শুধু মুসলমানদের প্রতিই নয়, সকল বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষ হিন্দু ধর্মেরই একটি সহজাত ব্যাপার। অতীতেও এ ধর্ম তার মৌলবাদী সর্বনাশা রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

পৃথিবীতে বিশেষ প্রচারিত ধর্মগুলোর মধ্যে ইহুদী ধর্মের মতই হিন্দু ধর্মের অনুসারী হওয়ার জন্য প্রয়োজন সে ধর্মাবলম্বীর গর্ভে ও বীর্যে জন্মগ্রহণের। হিন্দুত্বে ধর্মান্তরিত হওয়ার সুযোগ নেই। এই চরম মৌলবাদী রক্ষণশীলতা তার প্রাণশক্তি, যার বলে হিন্দু ধর্ম সমগ্র উপমহাদেশে শত শত বছর ধরে থেকে থেকে একটা আতিকায়, ক্ষুধার্ত মাংসাশী জন্তুর মত মোচড় দিয়ে উঠেছে আর প্রচুর মানুষের জীবন বিনাশ করে দিয়েছে পুঁতি গন্ধময় করে দিয়েছে সমকালের সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতির রূপ। নথিবদ্ধ ইতিহাস থেকে আমরা পাচ্ছি

এরকম বেশ কিছু দুর্যোগময় কালপর্বের বর্ণনা ঃ চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে গুপ্ত রাজবংশ, সপ্তম শতকে শশাঙ্ক, বারো শতকে বিদেশী সেন রাজবংশ এবং উনিশ শতকে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী দল, বিশ শতকে আবার রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব হিন্দু ধর্মের ঐ ভীবৎস ও প্রাণনাশী রূপ উপমহাদেশের রাজনীতি ও সমাজে সওয়ার হয়েছে। অতিসম্প্রতি গুজরাটে মুসলমান হত্যাকাণ্ডও তারই ধারাবাহিকতা।

ইতিহাসের একটি ভূমিকা হল মানব সমাজের পরিবর্তন, গতিবিধি ও কৃতকর্মের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে বর্তমানের ঘটনাবলীর ভবিষ্যৎ ফলাফল আন্দাজে সহায়তা করা। এ জন্য ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য বলা হয়ে থাকে। যে কোন সমাজ ও জাতির জন্যই তা জরুরি একটি প্রক্রিয়া। ইতিহাসকে উপেক্ষা করা বিপজ্জনক। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, আমরা বাঙালি মুসলমানরা ইতিহাসকে হয়তো নিছক অতীত কাহিনী ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। না হলে ভারতে বিজেপি'র উত্থানে ইতিহাস চেতনার সূত্রে আমাদের উপলব্ধিতে আসা উচিত ছিল যে, হিন্দুত্ববাদ যতবার রাষ্ট্রীয়ভাবে শক্তিশালী হয়েছে ততবারই সংকট ঘনিয়ে এসেছে এ উপমহাদেশের অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের ওপর। কিন্তু সতর্কতার পরিবর্তে আমরা কি করে মন্তব্য করি, ভারতে বিজেপি'র ক্ষমতাগ্রহণ বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করবে? এরচেয়ে জরুরি প্রশ্ন এখনও কি আমরা পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারছি? এবং সংকট কাটিয়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থ-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কৌশল কি আমরা গ্রহণ করছি? প্রস্তুতি ও কৌশল বলতে এখানকার হিন্দুদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা, তাদের বাড়ি-ঘর ভাঙ্গা, ভারতের বিরুদ্ধে মিছিল করা ও গালমন্দ করা কিংবা ভারতে মুসলিম হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করা প্রভৃতি ঘৃণ্য বা তুচ্ছ পদক্ষেপের কথা বোঝান হচ্ছে না। কৌশলটা হতে হবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর আমেরিকা ইসলামী দেশগুলোর ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। ইরাকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও আফাগানিস্তানে অমানবিক ধ্বংসযজ্ঞ গত কয়েক বছরের মার্কিন নীতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমেরিকা ইরাক ও ইরানে হামলা চালানোর প্রকাশ্য ঘোষণাও দিয়েছে। আমেরিকার মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাব ও পদক্ষেপ ভারতের মুসলিমবিদ্বেষে নতুন ঘৃতাহুতির মত। ভারতের পাকিস্তান আক্রমণের প্রবল আগ্রহ, গুজরাটে মুসলমানদের ওপর হিন্দুদের নির্যাতন কিংবা ফিলিস্তিনের ইসরাইলের বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ– এসবই মার্কিন নীতির ও গতিবিধির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। আরব পত্রিকাগুলো দাবি করছিল নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসে ১৯ জন মুসলিম তরুণ ছাড়াও জড়িত আছে অন্তত একটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থা। তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল বলেই আমেরিকা এ সম্পর্কিত আলোচনার মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। এখন

আমরা দেখতে পাচ্ছি, টুইন টাওয়ার ধ্বংসের সূত্রে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পুরো ফায়দা লুটছে ভারত ও ইসরাইল। ভবিষ্যতে এ যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়ার সম্ভাবনা অত্যধিক এবং তাহলে বাংলাদেশের জন্য তা কোনমতেই মঙ্গলজনক হবে না। আমাদের সবক'টি ফ্যাক্টর বিবেচনায় রেখে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার বিষয়টিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, আফগানিস্তানে যা ঘটে গেছে তা আসলে শুরু মাত্র। বোমার আঘাতে আর মার্কিন সেনাবাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্যে যেসব শিশু জন্ম নিয়েছে এবং বড় হয়ে উঠছে তাদের মধ্যে আমেরিকার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহা সৃষ্টি হবে। ফিলিস্তিন ও ইরাকের অনাহারী-অর্ধাহারী শিশুদের মধ্যে সেই ঘৃণা আরও আগেই জাগ্রত হয়েছে। কিউবা এবং ল্যাতিন আমেরিকা কয়েকটি দেশের মানুষের মধ্যে মার্কিনবিরোধী প্রচণ্ড ক্ষোভ বিরাজ করছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশের সাধারণ মানুষও আমেরিকার আচরণে ক্ষুব্ধ। আরব দেশগুলোর জনগণ আমেরিকান পণ্য বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছে ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক গণহত্যায় মার্কিন ভূমিকার জন্য। তাদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত আরব দেশগুলোয় মার্কিন ব্যবসায় বিরাট ধস নামানোর আশঙ্কা আছে।

মানব সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাস বলে এ ধরনের চরম পরিস্থিতি রাজনৈতিক বা ক্ষমতাকেন্দ্রিক পরিবর্তনের তরঙ্গাকার স্রোতে একটি সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন অস্থির বিন্দুমাত্র; এরপরই নিম্নমুখী বা ঊর্ধ্বমুখী গতি আসে তার। খুব সম্ভবত আমরা মানব সভ্যতার রাজনৈতিক বিন্যাসে একটি বড় পরিবর্তনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তের অস্থির বিন্দুর ওপর দাঁড়িয়ে আছি। সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে আর্থিক অবস্থান ও ধর্মীয় আবেগের দ্বারা। এ সূত্রেই আমাদের ভবিষ্যৎ শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করে যথাযথ অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। ওবেইদ জাগীরদার/ফয়েজ আলম

কুলদীপ নায়ারের নিবন্ধ

গুজরাটে মুসলিম হত্যাযজ্ঞের পর

গুজরাটের শাহ আলম ক্যাম্পের বাসিন্দাদের দিনেরবেলা কাটে কোনমতে। তবে রাত যেন তাদের জন্য অমানিশার অন্ধকার। নৃশংসতার শিকার মানুষের কান্না, আহাজারি আর কাউকে নির্মমভাবে পেটানো খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। নৃশংসতার শিকার হয়ে পরপারে চলে যাওয়া কারও আত্মা রাতে হয়তো হাজির হয় তার প্রিয়জনদের সামনে। এ ধরনের কোন আত্মা হয়তো তার এতিম শিশুকে বুকে জড়িয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে। গোটা ক্যাম্প যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন এ শিশুরা তখন হয়তো অপেক্ষা করে মাকে দেখার এবং বাবার সঙ্গে রাতের খাবার খাওয়ার। এক নিহত মায়ের আত্মা হয়তো তার

শিশুকে জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছ সিরাজ?' 'কেমন আছ মা? জবাব দেয় সিরাজ।' বাছা আমি এখন আত্মা হয়ে গেছি। এখন আর কেউ আমাকে পুড়িয়ে মারতে পারবে না। মায়ের জবাব! সিরাজের জিজ্ঞাসা, 'আমার অবস্থাও কি তোমার মতো হবে মা?'

কি হৃদয়বিদারক আর মর্মস্পর্শী অনুভূতি। উল্লিখিত আলেখ্যটি একটি হিন্দি নিবন্ধের অংশবিশেষ। শাহ্ আলম ক্যাম্পের জনৈক ব্যক্তি তা পাঠিয়েছেন আমার কাছে। গুজরাটে সাম্প্রতিক গণহত্যার পর কয়েক হাজার মুসলমান আশ্রয় নেয় এই ক্যাম্পে। তাদের দুর্ভোগ বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও জঘন্যতম দৃষ্টান্ত। আমি জানি না শাহ্ আলম ক্যাম্পের বাসিন্দাদের দুর্ভোগের রাত কবে পোহাবে যাদের অতীত ছিল, কিন্তু বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই। পুনর্বাসন তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রীর দফতর গুজরাট সরকারের ব্যাপারে বেশ নমনীয়। তারা বোঝার চেষ্টা করেননি, এটা হিন্দু মুসলমান ইস্যু নয়। এটা হচ্ছে মানবজাতির বিষয়। মানুষ হিসেবে বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা জাতির কাছে নয়, যে কোন সভ্যসমাজেই তাদের বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখনও আছেন বহাল তবিয়তে। সত্যি বলতে কি, তিনি এখন পরিণত হয়েছেন বিজেপির সৌভাগ্যের প্রতীকে। গুজরাটের সহিংসতা নিয়ে রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটাতে চায় তারা। ভারতের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও (এনএইচআরসি) শাহ্ আলম ক্যাম্পের বাসিন্দাদের মতোই অসহায়। রাজ্য সরকার সহিংসতা সম্পর্কে তাদের দ্বিতীয় রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছে। তবু আমার মতে এনএইচআরসির আরও অনেক কিছু করার আছে। অন্তত একটু হৈচৈ তো করতে পারে তারা। গুজরাটের এ সহিংসতায় একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে জ্বলন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে– রক্ষক নিজেই ভক্ষক হলে আমরা মানবাধিকার রক্ষা করব কিভাবে? রক্ষক বলে আমি বোঝাতে চেয়েছি পুলিশসহ রাজ্য সরকারের গোটা অবকাঠামোকে। এই গোটা মেশিনারিকে শুধু রাজনৈতিক স্বার্থেই নয়, আজকাল সাম্প্রদায়িক স্বার্থেও ব্যবহার করা হচ্ছে। গুজরাটের মতো ঘটনা কোন না কোন আকারে ঘটছে সারাদেশেই। পুলিশ বলুন আর প্রশাসনই বলুন সবই এখন কাজ করে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে। কয়েক বছর আগেও প্রশাসন আর পুলিশকে শাসকগোষ্ঠী ব্যবহার করত রাজনৈতিক কাজে। এখন জাতিগত এবং ধর্মীয় কারণেও ব্যবহার করা হচ্ছে অহরহ। এটা অবশ্যই উপহাসযোগ্য কাজ। কিন্তু তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। লজ্জিত হচ্ছে মানবাধিকার। শাসকগোষ্ঠী আজকাল হিতাহিত জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছেন। নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ তাদের কানে যায় না। ম্যান ড্যামের কথাই ধরুন। নর্মদা নদী এবং এর শাখা নদীগুলোতে যতগুলো বড় ড্যাম বা বাঁধ

নির্মাণ করা হয়েছে এটা তার অন্যতম। এই ড্যামের ফলে কয়েকশ' আদিবাসী পরিবারের তুলা চাষের বিশাল ভূমি প্লাবিত হবে। ভারতে এ ধরনের অন্যান্য ড্যামের মতো ম্যান ড্যামের ইতিহাসও প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার। ১৯৮৪ সারে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রণালয় এই প্রকল্পের পরিবেশগত আইনি ছাড়পত্র পায়। ছাড়পত্রের শর্ত ছিল, ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের অবশ্যই কৃষিযোগ্য ভূমিতে পুনর্বাসন করতে হবে। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ সরকার এ শর্ত সম্পূর্ণ লজ্ঘন করে ক্ষতিগ্রস্তদের শুধু নগদ ক্ষতিপূরণ দিয়েই দায়িত্ব শেষ করতে চায়।

আদিবাসীরা কিছু কৃষিযোগ্য ভূমি চিহ্নিত করে সেখানে পুনর্বাসিত হওয়ার আগ্রহ দেখায়। রাজ্য সরকারের কাছে তারা দাবি জানায়, সেচ সুবিধা দিয়ে ওই জমিকে অবিলম্বে আবাদযোগ্য করে তাদের বরাদ্দ দিতে হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থই হয়নি, পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা না করেই আদিবাসীদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়। বিপুলসংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ ও বনরক্ষী নিয়ে সরকারি কর্মকর্তারা তাদের ঘরবাড়ি ছাড়ার জন্য হুমকি দেয়। প্রতিরোধে এগিয়ে এলে চালানো হয় নির্বিচারে গুলি। অনেককে ধরে এনে পেটানো হয় নির্মমভাবে। গ্রামের বিপুলসংখ্যক গাছ কেটে সাবাড় করা হয়। পুড়িয়ে দেয়া হয় বহু ঘরবাড়ি ও প্রাইমারি স্কুল, দুটি মাধ্যমিক স্কুল, দুটি স্টোরহাউজ ও একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। গ্রামের বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

গত মাসে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের সব হ্যান্ডপাম্প গুঁড়িয়ে দিয়ে অমানবিক কাজের শেষ চূড়ায় ওঠে মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিংয়ের মধ্যপ্রদেশ সরকার। গ্রীষ্মের এমন সময় পাম্পগুলো গুঁড়িয়ে দেয়া হল যখন রাজ্যের তাপমাত্রা ৪৭-৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওদিকে ম্যান নদীও সম্পূর্ণ শুকনা। এ সময়ে হ্যান্ডপাম্প গুঁড়িয়ে দিয়ে শুধু মানবাধিকারই লজ্ঘন করা হয়নি, হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেয়া হয়েছে। প্রায় ৫ হাজার আদিবাসী পানির তৃষ্ণায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে। এই জঘন্য কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অকপটেই স্বীকার করেছেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন। বলেছেন, আদিবাসীদের উচ্ছেদের এটাই ছিল একমাত্র উপায়। তবে ক্ষতিগ্রস্তরা ভিটা ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মোকাবিলা করে এখনও তারা গ্রামে টিকে আছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস মোকাবিলা ছাড়াও তারা অঙ্গীকার করেছে, ড্যামের কারণে বর্ষা মৌসুমে সম্পূর্ণ প্লাবিত হলেও পুনর্বাসন না করা পর্যন্ত ঘরবাড়ি ছাড়বে না। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ভুপালে কিছু লোক অনশন ধর্মঘটও করেছে।

তবে উৎসাহব্যঞ্জক কথা হচ্ছে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার রক্ষায় সুপ্রিমকোর্ট হস্তক্ষেপ করছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

ফাওয়ের মতে, ভারতে ৪০ কোটিরও বেশি দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষের বসবাস। কিন্তু ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশেও মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসতে হয় সুপ্রিমকোর্টকে। সরকারি গুদামে খাদ্য ভর্তি থাকা অবস্থায় দুর্ভিক্ষে মানুষের মৃত্যু বেড়ে যাওয়ায় ২০০১ সালের নভেম্বরে সুপ্রিমকোর্ট সরকারের প্রতি একটি অন্তবর্তী আদেশ জারি করে। এতে বলা হয়, সরকারি গুদামের খাদ্য অবিলম্বে সরবরাহ করতে হবে। ভারতের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি আর গণমাধ্যমের জন্য এ ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক। মানুষের খাদ্য পাওয়ার যে অধিকার দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হয়ে আসছিল তা নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসতে হল বিচার বিভাগকে। ভারতে দুর্ভিক্ষে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা নতুন নয়। ভারত শুধু খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশই নয়, এর খাদ্য মজুদ সব সময় থাকে প্রয়োজনের চেয়ে তিনগুণ। এমন দেশে দুর্ভিক্ষে কেন এত লোক মারা যায় সে ব্যাপারে তদন্ত চালাতে আজও কোন কমিশন গঠন করা হয়নি। এই প্রথমবারের মতো খাদ্য পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছল। গত বছর মে মাসে পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টি নামের একটি সংগঠন এ ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টে মামলা করে। তারা দাবি জানায়, মানুষের ব্যাপক অপুষ্টির জন্য কয়েকটি কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং রাজ্য সরকার দায়ী বলে ঘোষণা করতে হবে। এ মামলার এক অন্তর্বর্তী আদেশে সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, যারা নিজেদের খাবার নিজেরা জোগাড় করতে পারে না তাদের খাবার পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব সরকারের। এতে সেসব মানুষ আর দুর্ভিক্ষ কিংবা অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভুগবে না।

উদ্ধৃতি ঃ যুগান্তর, ২ জুলাই ॥ দি হিন্দু থেকে অনুবাদ।

সাম্প্রদায়িক সংকট মোকাবিলায় সম্প্রীতির হাতিয়ার প্রতীক্ষা রুদ্ধ বিবেক উন্মোচনের

উগ্র হিন্দুবাদ ভারতীয় আধুনিকমনা মানুষকে যে কি পরিমাণ পীড়া দেয় তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া বোঝা কঠিন। ধর্মান্ধ হিন্দুদের কিছু অন্যায় আবেগকে বরাবরই রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে ভারতীয় রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার পাশা খেলায় এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য কতটুকু পথ তারা এগোতে পেরেছেন সে বিচার ইতিহাস করবে, তবে তাদের এহেন অবিমৃশ্যকারিতায় জাতি হিসেবে ভারতীয়রা যে অনেক ছোট হয়ে গেছে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অন্তত হিমালয়ান উপমহাদেশের মানব জনবসতির নেতৃত্বের যোগ্যতা তারা নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজিব গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড, রাজিব গান্ধী সরকারের সময় বোফোর্স কেলেঙ্কারি, ভারতব্যাপী স্লোগান' গলি গলি ম্যায় শোর হ্যায়॥ রাজিব গান্ধী চোর হ্যায়। 'এরপর

অস্থিতিশীল সরকার আর ঝুলন্ত সংসদ, অমুক তমুক প্রধানমন্ত্রী এবং অতঃপর আর্থিক দুর্নীতির দায় মাথায় নিয়ে একের পর এক নেতার নাজেহাল হওয়ার পালা, সবশেষে সামনে আসে তেহেলকা ডট কম উদঘাটিত মহা-কেলেঙ্কারির দুনিয়া কাঁপানো ঘটনা। একটি ঐতিহ্যবাহী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আর বনেদী ভূখণ্ডের গর্বিত উত্তরাধিকার নিয়ে অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলা দেশ ভারতের শাসকশ্রেণী তথা রাজনৈতিক শক্তির চরিত্র ও নৈতিকতার কাঙ্ক্ষিত মান আরও হাজার গুণ উপরে থাকার কথা ছিল। কিন্তু নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর বরফ পানি ঢেলে দিয়ে ভারতীয় নেতারা অবস্থান করছেন অন্তত দু'হাজার বছর আগের অন্ধকার যুগে। ভারতের স্কুলছাত্ররা যখন মহাকাশ অভিযাত্রী রাকেশ শর্মাকে নিয়ে অহংকার করে, যখন নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা বিশ্ব আইটি ভুবনে ভারতীয়দের দৃপ্ত পদভারে গর্বিত তখন নেতারা আছেন বিখ্যাত ভারতীয় শহরগুলোর নাম বদলে বিভিন্ন দেব-দেবীর নামের সাথে মিলিয়ে নাম রাখার চিন্তায়। শত শত বছরের ঐতিহ্য প্রচলন ও পরিচিতি ভেঙ্গে তারা মাদ্রাজকে করেছেন চেন্নাই আর বোম্বেকে করেছেন মুম্বাই।

এ তো তাদের নাম বদলের বিষয়। একশ্রেণীর নেতা তো ক্ষমতার অপব্যবহার করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষী বাহিনীর সহায়তায় সংঘটিত করান সভ্য দুনিয়ার ললাটে অমানবিকতার কলংক তিলক 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা'। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ ধরনের দাঙ্গার দাঙ্গার পরিমাণ কমপক্ষে ১৮ হাজার। সারা ভারতের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কমবেশি ২৭ কোটি মুসলমানের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে মাঝে মধ্যেই সংঘটিত করা হয় দাঙ্গা। দাঙ্গার প্রধানতম উদ্দেশ্য নির্বাচনে মুসলিম ভোটের একটা হিল্লা করা। যে বছর আদর-যত্ন করে ভোট বাগানো যাবে সে বছর দাঙ্গা হবে না। আর যে বছর মেরে কেটে ভোটের ধারা পাল্টে দেয়া যাবে সে বছর দাঙ্গা বাঁধবে। মোটামুটি এই হল দাঙ্গার মূলনীতি। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার পর উগ্রবাদী হিন্দু দাঙ্গাকারীরা সারা ভারতে যে হত্যাযজ্ঞ চালায় তা সাধারণ ভারতীয়দের হতভম্ব করে দেয়। মিরাটের দাঙ্গায় আধুনিক ভারতীয় নাগরিক সমাজ আহত বোধ করে। এরপর বাবরী মসজিদের স্থলে রামমন্দির নির্মাণকে সামনে রেখে একদল করসেবকের ট্রেনযাত্রা, সে ট্রেনে জনৈক মুসলিম মহিলা যাত্রীর সাথে করসেবকদের একাংশের গর্হিত আচরণ আর বোরকা খুলে ছুড়ে ফেলার ফলে সৃষ্ট তিক্ততা এবং গোধরা রেল স্টেশনে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের দ্বারা ট্রেনে অগ্নিসংযোগ এবং তৎপরবর্তী দাঙ্গা পরিস্থিতি ভারতীয় সাধারণ নাগরিকদের মনমানসিকতায় কী ছাপ ফেলছে তা খুবই বিবেচ্য। উন্নত গণমাধ্যমের কল্যাণে পৃথিবীর মানুষ আজ দেখতে পাচ্ছে উগ্র ধর্মান্ধতার ভয়াল

রূপ। যদিও বিশ্বের কোন ধর্মেই নিরপরাধ মানুষকে হত্যা, সম্পদের ক্ষয় আর ধ্বংসের কথা বলা নেই। কিন্তু যারা ধর্মের নামে অধর্মের চর্চা করে তারা কি ধর্মের কাহিনী শুনতে রাজি হবে? উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে ধেয়ে আসা মনুষগুলো যদি ধর্মের মর্মবাণী বুঝতো তাহলে প্রাণভয়ে পালিয়ে বাঁচা শিশুদের ধরে ধরে পুনরায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে পারত না ওরা। একই বাড়িতে পুড়িয়ে মারতে পারত না ২০ জন মানব সন্তানকে। ফজরের জামাতে নামাজরত সকল মুসল্লিকে তালাবন্ধ করে মসজিদসহ জ্বালিয়ে খাক করে দিতে পারত না পরমেশ্বরে বিশ্বাসী কোন মানুষ!

গুজরাট রাজ্যে বিশেষ করে প্রাদেশিক রাজধানী আহমেদাবাদে ঐতিহ্যবাহী মুসলিম এলাকা সুরাটে সম্প্রতি যে সুপরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে সমকালীন ভারতীয় অধিকাংশ সংবাদপত্র এর একটি নিরপেক্ষ চিত্র রেকর্ড করে রেখেছে। বিশেষ করে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা আনন্দবাজার এ প্রসঙ্গে যে সাহসী সম্পাদকীয় ছেপেছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এতে একাধারে উগ্রবাদী হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন নেতৃত্ব গুজরাটের প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানী, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীসহ প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তিকেই এ হত্যাযজ্ঞের জন্য দায়ী করা হয়। শুধু আনন্দবাজার নয় এ কথা সারা ভারতের সকল বিবেকবান মানুষের। মান্ধাতার আমলের ধারায় পরিচালিত ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের হঠকারিতা আর একশ্রেণীর উগ্র ধর্মীয় নেতার অমানবিক আচরণে ভারতের নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক বিশেষ করে আধুনিক জগতের সাথে যুক্ত নতুন প্রজন্মকে যে কী পরিমাণ লজ্জিত হতে হয় তা কি সংশ্লিষ্টরা বুঝতে চেষ্টা করবেন? প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে অযোধ্যায় মুসলিম শাসন প্রতিনিধি মীর বাকী কর্তৃক নির্মিত বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার সময় উগ্রবাদী হিন্দু নেতারা এ কথাও বলেছিলেন যে, দিল্লীর কুতুব মিনারও একটি হিন্দু স্মারক স্তম্ভ। আগ্রার তাজমহলও হিন্দু মন্দির। দিল্লীর জামে মসজিদও একটি হিন্দু স্থাপত্য। এ সময় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে ভারতীয় প্রতিনিধিদের মাথা হেঁট অবস্থা দেখে অন্যসব প্রতিনিধির মনে যে করুণার উদ্রেক হত তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। একদল মূর্খ ও মূঢ় রাজনীতিক বা ধর্মতাত্ত্বিকের প্রতিপত্তির আওতায় বসবাস করা শিক্ষিত, যুক্তিবাদী ও আধুনিক মনস্ক মানুষের মনোকষ্ট কেবল সমগোত্রীয় ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারবেন। দিল্লী জামে মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ আবদুল্লাহ বুখারী ঠিকই বলেছেন, যারা ধর্মের নামে নারী ও শিশুসহ নিরপরাধ শত শত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করতে পারে, তাদের কোন ধর্ম নেই, তাদের কোন জাতও নেই। ১৯৮৪ সালে শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিহত হলে সারা ভারতে দাঙ্গা শুরু

হয়। ইন্দিরাভক্ত হিন্দুরা যত্রতত্র শিখদের হত্যা করতে শুরু করে। রেলের বগিতে ও রেল স্টেশনে পুড়িয়ে মারা হয় অনেক শিখ যাত্রীকে। এরপর ক'মাস ধরে ভারতীয় সংস্কৃতিতে এ ধরনের নৃশংসতা তথা পুড়িয়ে মানুষ হত্যার বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়। ঘটনা প্রবাহে এ সময়টিতে শিখ সম্প্রদায় হিন্দুদের অনেকটা এড়িয়ে চলতে শুরু করে এবং স্বভাবতই অপর সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এ পর্যায়ে ভারতীয় মুসলিম লেখকদের একটি ফোরাম একটি বিবৃতি প্রদান করে। বোম্বের একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন ডেকে তারা তাদের বক্তব্য পেশ করে। বিবৃতিতে একটি কথা ছিল এমন, 'মাত্র কয়েক ঘণ্টা একসাথে রেলে ভ্রমণ করলেও ভদ্রলোকেরা সহযাত্রীর খোঁজ-খবর নেয়। তার সাথে পরিচিত হয়। কিন্তু হাজার বছর একই দেশে বসবাস করে এবং ভারতীয় সভ্যতায় অসাধারণ অবদান রেখেও আমরা মুসলমানেরা কি আমাদের হিন্দু ভাইদের কাছে এতটুকু সৌজন্যও আশা করতে পারি না যে, তারা আমাদের সাথে পরিচিত হবেন বা আমাদের খোঁজ-খবর নেবেন। আমাদের জান-মাল, মসজিদ-মাদ্রাসা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্মারক-স্থাপত্য তাদের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে!' এ বক্তব্যের ওপর একজন বিখ্যাত শিখ লেখক ও কলামিস্ট মন্তব্য করেছিলেন, 'সহযাত্রীর খোঁজ-খবর না নেয়াই ভাল। যখন ওনারা খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেন তখন যে কিভাবে নেন তা কি আপনারা জানেন না? ইন্দিরাজী নিহত হওয়ার পর আমরা শিখেরা কিছুটা টের পেয়েছি সহযাত্রীর খোঁজ-খবর কাকে বলে।'

মূলত জাতীয় নির্বাচন সামনে নিয়েই ভারতে শুরু হয় প্রতিবেশী বা সহযাত্রীর খোঁজ-খবর। বিশেষ করে হিন্দুত্ব আর ধর্মরক্ষার শ্লোগান পুঁজি করে ক্ষমতায় আসা ভারতীয় জনতা পার্টির নানা প্রদেশে ভরাডুবি দেখেও ধর্মান্ধ রাজনীতির ধারকরা মুসলমানদের একটু শিক্ষা দিতে চেষ্টা করছেন। তবে আশার বিষয় এটিই যে সারা ভারতে বিপুলসংখ্যক সুস্থ মানুষ এসব নোংরা রাজনীতিকে অপছন্দ করেন। হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সকল ধর্ম, বর্ণ ও মতাদর্শের অনুসারী ভারতীয় নাগরিক সমাজ একটি পরমতসহিষ্ণু উন্নত ও আধুনিক ভারতের স্বপ্ন দেখে খুব আন্তরিকভাবে, বিপুল আশাবাদিতায়। কিন্তু অসংখ্য ইতিবাচক প্রাপ্তির পাশে যখন নেতৃবর্গের অন্যায় হঠকারিতা ও নোংরা রাজনীতির জঘন্য দিকটি ভারতীয়দের সামনে মুখ ব্যাদান করে দাঁড়ায় তখন তাদের শরমে মরে যেতে হয়। অনেকটা ময়ুরের পায়ের মত ব্যাপার। জনশ্রুতি আছে, রূপ সৌন্দর্যের গর্ব নিয়ে পেখম মেলে ময়ূর যখন আত্মপ্রসাদের চরমে ওঠে তখন নাকি নিজের অসুন্দর পায়ের দিকে নজর পড়তেই তার সকল গর্ব-অহংকার উবে যায়। পেখমও বন্ধ হয়ে আসে। একদিকে ভারতীয় স্বদেশমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানী গুজরাট সফরকালে বলেছেন, গুজরাটের সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ভারতের কলঙ্ক।

অপরদিকে প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, দাঙ্গার জন্য মুসলমানরাই দায়ী। যখন প্রশ্ন করা হয়, গোধরার ঘটনার পর যখন হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনগুলো দু'দিনের বন্‌ধ ডাকে তখন সহিংসতা এড়াতে কেন সেনা বা বিশেষ পুলিশ তলব করা হল না। এর জবাবেও মোদি বলেছেন, মুসলমানদের উস্কানিতেই দাঙ্গা বেধেছে। সত্তরোর্ধ্ব সাবেক এমপি কংগ্রেস নেতা এহসান জাফরীকে যে, পরিবারের সকল সদস্যসহ পুড়িয়ে মারা হল, এ বিষয়ে মন্তব্য করতে বলা হলে মোদি বলেন, জাফরী দাঙ্গাবাজদের প্রতি পিস্তল তাক করেছিলেন। জাফরী পরিবারসহ একটি অভিজাত মুসলিম কলোনির সকল বাসিন্দার ওপর যখন কিয়ামত সংঘটিত হতে চলছিল তখন দীর্ঘক্ষণ মোবাইল ফোনে পুলিশী সহায়তার জন্য কাকুতি-মিনতি করেও জনাব জাফরী কোন সাড়াই পাননি, তখন আত্মরক্ষার জন্য বৈধ অস্ত্র হাতে নেয়া উস্কানির পর্যায়ে পড়ে কিনা, সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মোদি কিছু না বলে নীরব থাকেন। এমনকি দাঙ্গার শেষ পর্যায়েও আইন-শৃংখলা বাহিনী কেবল দাঙ্গা পরবর্তী সময় অকুস্থলে গিয়ে মুসলমানদের লাশ উদ্ধারের কাজ সম্পাদন করেছে আর ফটো সাংবাদিকসহ সকল সংবাদপত্রীর জন্য দাঙ্গা-অঞ্চলটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে গেছে। ব্যাপক দায়িত্বহীনতার মাধ্যমে মুসলিম নিধনযজ্ঞে পরোক্ষ সহায়তাদানকারী মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে ২১টি মুসলিম সংগঠনের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত বিশাল এক বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দানকালে দিল্লীর শাহী ইমাম বিজেপি সরকারের উদাসীনতারও কঠোর সমালোচনা করেন। ১৫ মার্চ অযোধ্যায় করসেবকদের মন্দির নির্মাণ কর্মসূচীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা, বিচারালয়ের সাহায্যে বাবরী মসজিদ পুনঃনির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সনাল ল-বোর্ড নেতৃবর্গ এক বিবৃতি দিয়েছেন। তারা ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অভিভাবরূপে সরকারকে তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে বিরাজিত পরিস্থিতির আলোকে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় সরকার সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন, মন্দির ও হিন্দু ধর্মীয় স্থাপনাগুলোয় পুলিশ প্রহরা জোরদার করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ নাগরিকদের চিন্তা-চেতনা খুবই স্পষ্ট। বরাবরের মতই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য বজায় রাখতে তারা সচেষ্ট থাকবেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কিংবা কোন অপশক্তির পারপাস সার্ভ করতে কেউ যদি এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় ও সম্প্রীতিবদ্ধ মানুষ সম্মিলিতভাবে তা মোকাবিলা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বর্তমান বিবেকানুকূল সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নস্যাতে কোন মহল যে সচেষ্ট নয় একথা

জোর দিয়ে বলা যায় না। বিশেষ করে কোন কোন সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশন ভঙ্গি থেকে নাগরিক মনে শঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, এমন কায়দার প্রচারণা না আবার উস্কানির কাজ করে। কিন্তু মূল ধারার সংবাদ মাধ্যম ও ধর্মপ্রাণ বিবেকমান নাগরিকদের শুভ প্রয়াস বাংলাদেশের পরিস্থিতি অতীতের মতই শান্তিময় রাখতে সক্ষম।

এ পর্যায়ে সংবাদপত্রের দায়িত্ব অনেক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা সমীচীন বোধ করছি। মন্ত্রী বলেছেন, পূজার বিসর্জনের প্রতিমা নদীতে ভেসে গিয়ে চরায় আটকা পড়েছে। এর ছবি তুলে এনে সংবাদপত্রে প্রচার করা হচ্ছে হিন্দুদের দুরবস্থার চিত্ররূপে। এমন যেন না হয়। কেননা, সত্য তুলে ধরার দায়িত্ব যেমন সংবাদপত্রের, অসত্যকে প্রশ্রয় না দেয়াও তার পবিত্র দায়িত্ব। একশ্রেণীর লেখক, সাংবাদিক, কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে দায়িত্ব পালন করেন, সংবেদন নিয়ে লেখালেখি করেন, নানাভাবে প্রতিবাদ ও ঘৃণা প্রকাশ করেন, আমাদের মনে হয় ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়েও তাদের সমান উৎকণ্ঠা নিয়েই সোচ্চার হওয়া উচিত। মিছিল মিটিং, অনশন, প্রতিবাদ, মানববন্ধন ইত্যাদিতে সমান সংবেদনই ফুটিয়ে তোলা উচিত। নয়ত তাদের ব্যাপারে এদেশের সাধারণ মানুষের মনে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়ারসমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে।

রাজনৈতিক নেতৃবর্গেরও কাকের মত চোখ বন্ধ করে নিজের স্বার্থচিন্তা সেরে ফেলার চেষ্টা করা উচিত নয়। কেননা, তারা চোখ বন্ধ করে রাখলেও বাকি দুনিয়া যে চোখ,কান খোলা রেখেই চলছে এ বিষয়টি তাদের ভুলে গেলে চলবে না।

নিবন্ধের শেষ পর্যায়ে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একখানা হাদীস আর ইসলামের ইতিহাস থেকে একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা উল্লেখের লোভ সংবরণ করতে পারছি না। হাদীস শরীফের মর্মবাণী এই যে, 'মুসলিম সমাজে অবস্থানকারী সংখ্যালঘুরা মুসলিম জনগণের কাছে আল্লাহপাকের পবিত্র আমানত। রোজহাশরে মহানবী (সা.) নিজে তাদের পক্ষ নিয়ে ফরিয়াদী হবেন।' ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরব ভূখণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলে বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টান নাগরিক বসবাস করত। মিসরের শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা.)-এর দরবারে একদল খ্রিস্টান এসে বলল যে, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা আমাদের জনপদে প্রবেশ করে যীশুর প্রস্তরমূর্তির নাক ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। আমরা এর বিচার চাই। হযরত আমর ইবনুল আ'স কেঁদে ফেললেন। বললেন, ভাই, তোমাদের ধর্মীয় বিষয়াদির সুরক্ষা ছিল আমার ওপর

ফরজ। তোমাদের জান, মাল ও ইজ্জতের মত ধর্মকর্মের অঙ্গনেও শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্বও ইসলামী সাম্রাজ্যের তরফ থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে। আমি ব্যর্থ হয়েছি। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ একজন উঠে এস এবং এক্ষুণি এই তরবারি দিয়ে আমার নাক কেটে দাও। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একজন মহামান্য সাহাবীকে এমন অকৃত্রিম আবেগে আপ্লুত হতে দেখে খ্রিস্টান নাগরিকদের এ প্রতিনিধি দলটি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। এক পর্যায়ে তারা বলল, আপনার আন্তরিকতা ও দায়িত্ব স্বীকারে আমরা মুগ্ধ। স্বধর্মীয় শাসকদের কাছেও আমরা এমন হৃদয় নিংড়ানো অনুভূতির পরশ পাইনি। ধন্য আপনার ধর্ম। ধন্য আপনার শাসন ব্যবস্থা। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এ ঘটনার প্রভাবে গোটা পশ্চিমাঞ্চলীয় আরব ভুখণ্ডে তথা রোমক শাসক প্রভাবিত এলাকায় ইসলাম ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং সংশ্লিষ্ট খ্রিস্টান জনপদে মুসলিম জনসংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ইসলামের এই অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও শক্তিমত্তা আর বিশ্বজয়ী ভালবাসার পয়গাম যেন কোন অবস্থায়ই আমরা ভুলে না যাই।

সুসময় দুঃসময় সর্বাবস্থায়ই ইসলামের প্রেমের বাণী পৃথিবীর সকল এলাকার মানব সন্তানকে সমানভাবে ঘায়েল করতেই থাকবে। রক্ত আর বারুদের মোকাবিলায় শত সহস্রবার ফুল আর অশ্রুর বিজয় মানবেতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে। প্রাচ্যের মহাকবি আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালের কবিতায় ঃ

ইয়াকী মোহকাম আমল পায়হাম, মাহাব্বাত ফাতেহে আলাম ॥

জিহাদে জিন্দেগানি মে এহি মরদো কি শমশীরে।

অর্থাৎ, নিজ ধর্মের প্রতি অটল ভক্তি ও বিশ্বাস, অব্যাহত কর্ম সাধনা আর বিশ্বজয়ী সম্প্রীতি ও ভালবাসার অনিঃশেষ ধারা; মানবজীবনের কঠিন যুদ্ধে এগুলোই তো হচ্ছে মোক্ষম যুদ্ধাস্ত্র।

উপমহাদেশের ৫০ কোটি মুসলমানের আর কিছু থাক বা না থাক, মোক্ষম এ অস্ত্রগুলো তো আছে!

উদ্ধৃতি ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ মার্চ ২০০২ ॥

লেখক ঃ উবায়দুর রহমান খান নাদভী।

সমাপ্ত

প্রথম সুযোগেই সংগ্রহ করুন

মাওলানা নদভীর আরো বই